ভেবে দেখো খুঁজে দেখো

১। **বেমানান শব্দটি খুঁজে বের করো :**

১.১) তামা, কাঁসা, পাথর, লোহা

১.২) ঘোড়া, হাতি, গন্ডার, ষাঁড়

১.৩) কালিবঙ্গান, মেহেরগড়, বানাওয়ালি, ঢোলাবিরা

২। **নীচের বাক্যগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল লেখো :**

২.১) লিপির ব্যবহার সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য।

২.২) মেহেরগড় সভ্যতা আবিষ্কার করেন দয়ারাম সাহানি।

২.৩) হরপ্পা সভ্যতা প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতা।

২.৪) হরপ্পার মানুষ লিখতে জানতেন।

৩। **সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৩.১) হরপ্পা সভ্যতার বাড়িঘরগুলি তৈরি হতো — (পাথর দিয়ে/পোড়া ইট দিয়ে/কাঠ দিয়ে)।

৩.২) হরপ্পা সভ্যতা ছিল — (পাথরের যুগের/ লোহার যুগের/ তামা ও ব্রোঞ্জ যুগের) সভ্যতা।

৩.৩) ভারতীয় উপমহাদেশে হরপ্পাতেই — (প্রথম নগর / প্রথম গ্রাম/ দ্বিতীয় নগর) দেখা গিয়েছিল।

৪। **নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন / চার লাইন) :**

৪.১) তোমার জানা কোনো একটি শহরের সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার শহরের মিল-অমিলগুলি খুঁজে বার করো।

৪.২) সিন্ধুনদীর তীরে হরপ্পা সভ্যতার শহরগুলি কেন গড়ে উঠেছিল বলে তোমার মনে হয়?

৪.৩) হরপ্পা সভ্যতায় কী ধরনের বাড়িঘর পাওয়া গেছে? সেগুলিতে কারা থাকতেন বলে মনে হয়?

৪.৪) তোমার কি মনে হয়, হরপ্পা সভ্যতার মানুষ স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন? তোমার স্থানীয় অঞ্চলে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হরপ্পার মানুষের থেকে কোন কোন বিষয় তুমি শিখবে?

৫। **হাতেকলমে করো :**

৫.১) হরপ্পা সভ্যতায় শহর ও মানুষের জীবন কেমন ছিল? তার ছবি দিয়ে চার্ট তৈরি করো।

৫.২) হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন প্রত্ন-নিদর্শনগুলি মাটি, পিচবোর্ড বা থার্মোকল দিয়ে বানাও। ঐ প্রত্ন-নিদর্শনগুলি হরপ্পা সভ্যতার ইতিহাস জানতে কীভাবে সাহায্য করে?

৪

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা

দ্বিতীয় পর্যায় : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-৬০০ অব্দ

ঠা*কুমার ঝুলি* পড়ে তানিয়ার মনে অনেক প্রশ্ন তৈরি হলো। রুবির দাদুর কাছে একদিন ও জানতে চাইল সেগুলোর উত্তর। আচ্ছা দাদু, রাক্ষস-রাক্ষসীরা কি সত্যিই ভয়ানক দেখতে হয়?

অরুণ বলল, মেলার মাঠে রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখেছি। রাবণ তো রাক্ষস রাজা। তাই হারুকাকা রাবণ সাজার জন্য মুখে কালি মেখেছিলেন।

তিতির বলল, দাদু, রামায়ণের রাবণের সত্যিই দশটা মাথা ছিল?

দাদু সবসময় ওদের প্রশ্ন শুনে খুশিই হন। বললেন, মানুষের কল্পনায় আর কথায় এভাবেই গল্পগাথা তৈরি হয়। রাক্ষসের যে বর্ণনা তোমরা জানো, সে সবই মানুষের কল্পনা। রামায়ণের গল্পকথায় কিন্তু রাবণ খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন। আর দশটা মাথা মানে দশ দিকে যার মাথা খাটে।

পলাশ বলল, তাহলে রাবণকে কবে থেকে আর কেন ভয়ানক ভাবা শুরু হলো?

দাদু বললেন, এই তো ইতিহাসের *কেন* ও *কবে* তোমাদের ভাবাতে শুরু করেছে। *রামায়ণ* কী তা তোমরা সবাই জানো?

সুরাইয়া বলল, *রামায়ণ* তো রাম-রাবণের যুদ্ধের গল্প। আচ্ছা দাদু, *রামায়ণ* কি ইতিহাস?

দাদু বললেন, ইতিহাস সবেতেই আছে। কোথায়, কতটা, কীভাবে ইতিহাস লুকিয়ে আছে সেটা খোঁজাই ইতিহাসের গোয়েন্দার কাজ। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মোবাইল ফোনে কথা বলেছ বা দেখেছ। মোবাইল নিয়ে নিজের রাজ্য বা দেশের বাইরে গেলে বেশি টাকা কাটে কেন জানো?

অরুণ বলল, বাইরে ঘোরা বা *রোমিং* (**Roaming**)-এর জন্য।

দাদু বললেন, ইংরেজিতে **Roaming** শব্দটার একটা মানে হলো *ঘোরা*। আবার সংস্কৃতে *রাম* শব্দের একটা অর্থ *যিনি ঘুরে বেড়ান*। খেয়াল করো ইংরেজি আর সংস্কৃত শব্দ দুটির অর্থের মধ্যের মিলটা। কোনো এক সময়ে একদল যাযাবর ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছিল ভারতীয় উপমহাদেশে। সেখানকার পুরোনো বাসিন্দাদের সঙ্গে শুরু হলো তাদের মেলামেশা। তার সঙ্গে চলল যুদ্ধ-লড়াই। সেই যুদ্ধে বেশিরভাগ সময় বাইরে থেকে আসা মানুষগুলি জিতে গেল। তারপর আস্তে আস্তে উপমহাদেশের উত্তর অংশে তারা বসতি তৈরি করল। ধীরে ধীরে দক্ষিণ অংশেও ছড়িয়ে পড়েছিল তারা। মনে করা হয়, দক্ষিণ অংশে ছড়িয়ে পড়ার সেই কাহিনিই রামায়ণে পাওয়া যায়।

যুদ্ধে জয় আর বসতি গড়ে তোলার কথা ঘিরে তৈরি হলো অনেক গল্প। সেগুলি ফিরতে লাগল মুখে মুখে। সেই গল্পগুলোতে যুদ্ধে হেরে যাওয়া মানুষদের অন্যরকমভাবে দেখানো হলো। তারা কখনও *রাক্ষস* বা *অসুর*, কখনও বা *দৈত্য*। তাছাড়া তারা কখনও *অসভ্য* বা *দস্যু*। *রামায়ণ* সেই যুদ্ধে জেতা মানুষদের গল্প। তাই হেরে যাওয়া রাবণ সেখানে খারাপ ও ভয়ানক।

পরের দিন ইতিহাসের ক্লাসে দাদুর বলা কথাগুলো বলল তানিয়া। দিদিমণি বললেন, রামায়ণের ও মহাভারতের গল্পের আগের অনেক গল্পকথাও জানা যায়। সেইসব কথা আছে *বেদ*-এ। আজ আমরা সেই সময়ের কথাই জানব।

৪.১ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পরিবার

তোমরা *রাম* ও Roaming শব্দের মিল পেয়েছ অর্থে ও উচ্চারণে। এমনই আরও অনেক শব্দ আছে। যেমন ধরো, বাংলায় *মা*, সংস্কৃতে *মাতঃ* বা *মাতৃ*, ইংরাজিতে Mother, লাতিন-এ *মাতের*। *পিতৃ* বা *ভ্রাতৃ* শব্দগুলোরও এমনই মিল রয়েছে বেশ কিছু ভাষার শব্দের সঙ্গে। উচ্চারণ ও অর্থের মিল কিন্তু এমনি এমনি হয় না। মানুষের পরিবারের মতো ভাষারও পরিবার আছে। সেই একই পরিবারের ভাষাগুলির মধ্যে বেশ কিছু মিল থাকে। তেমনই একটা ভাষা পরিবার হলো *ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার*। ভারতীয় উপমহাদেশ ও ইউরোপের অনেক ভাষাই এই ভাষা পরিবারের সদস্য। এদেরকে তাই একসঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার বলা হয়। এই ভাষা ব্যবহারকারীরা কোথায় থাকতো?

শব্দের ব্যবহার থেকে মনে হয় যে, তারা তৃণভূমি অঞ্চলের মানুষ ছিল। কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত শব্দ বিশেষ ব্যবহার হয়নি। বেশিরভাগ ঐতিহাসিকের মতে তারা মধ্য-এশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চলের যাযাবর ছিল। তাদের নিজেদের ও তাদের পালিত পশুর খাদ্যের অভাব দেখা দিলে তারা ছড়িয়ে পড়ে নানা দিকে। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে, ইরানে ও ভারতে।

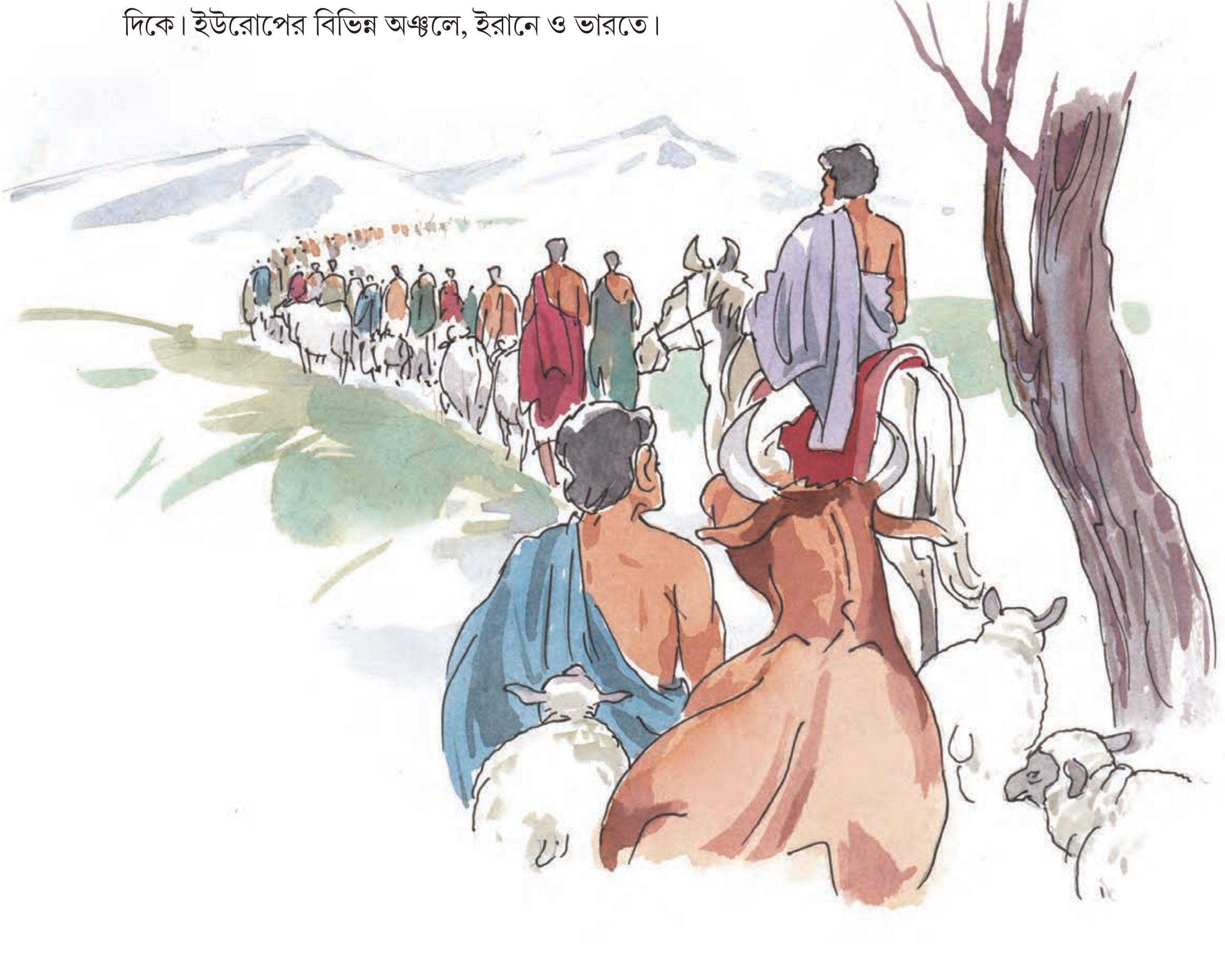

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের এক সদস্য *ইন্দো-ইরানীয় ভাষা*। ঐ ভাষা মানুষের মুখে ধীরে ধীরে বদলে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় পরিণত হয়েছে। তার সঙ্গে মিশেছে নানান আঞ্চলিক শব্দ। সংস্কৃত ভাষা সেই ভাষাগুলির মধ্যে একটি।

আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বর্তমানে আর নেই। *ঋকবেদ* ও *জেন্দ-অবেস্তায়* ইন্দো-ইরানীয় ভাষার প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই দুটি সাহিত্যের ভাষায় ও বর্ণনায় বেশ কিছু মিল দেখা যায়। এর থেকে ইন্দো-ইরানীয় ভাষার অস্তিত্ব জানা যায়। তবে মিলের পাশাপাশি ঐ দুই রচনায় বেশ কিছু অমিলও দেখা যায়। যেমন, ঋকবেদে যারা *দেব*, তারা সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু অবেস্তায় যারা *দয়েব* (দেব), তাদের ঘৃণা করা হতো। আবার অবেস্তার শ্রেষ্ঠ দেবতা *অহুর*। অথচ বৈদিক সাহিত্যে *অসুর* (অহুর) খারাপ বলে পরিচিত। হয়তো কোনো কারণে ইন্দো-ইরানীয় ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ তৈরি হয়েছিল। তার ফলে ঐ গোষ্ঠীর একটি শাখা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে পৌঁছেছিল। এদেরই *ইন্দো-আর্য ভাষা গোষ্ঠী* বলা হয়। এক্ষেত্রে মনে রেখো **আর্য কোনো জাতিবাচক শব্দ নয়**। ইন্দো-আর্য ভাষারই সবথেকে পুরোনো সাহিত্য *ঋকবেদ*।

অনেকে অনুমান করেন উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ইন্দো-আর্যরা ভারতে ঢুকেছিল। বৈদিক সাহিত্য থেকেই এই ইন্দো-আর্যদের বসতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানা যায়। তাই এই সভ্যতার নাম *বৈদিক সভ্যতা*।

???

ভেবে দেখো

১. তুমি কোন ভাষায় কথা বলো? সেই ভাষাটি কোন ভাষা পরিবার থেকে এসেছে বলে মনে হয়?

২. বলতে পারো ইন্দো- ইউরোপীয়রা তৃণভূমি অঞ্চলে কেন বাস করত?

৪.২ বৈদিক সভ্যতা ও বৈদিক সাহিত্য

বৈদিক সাহিত্য বলতে কী বোঝায়? *বেদ* এসেছে *বিদ* শব্দ থেকে। *বিদ* মানে *জ্ঞান*। সমস্ত বৈদিক সাহিত্য চার ভাগে ভাগ করা যায়। *সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক* ও *উপনিষদ*। *ঋক, সাম, যজুঃ* ও *অথর্ব* --- এই চারটি হলো সংহিতা। সংহিতাগুলি ছন্দে বাঁধা কবিতা। *ঋকবেদ* সবথেকে পুরোনো বৈদিক সংহিতা। ঋকবেদ রচনার ভাষা আর ভৌগোলিক পরিবেশের উল্লেখ থেকে তা বোঝা যায়। বাকি তিনটি সংহিতা ও অন্যান্য বৈদিক সাহিত্য ঋকবেদের পরের রচনা। তাই সেগুলিকে *পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য* বলা হয়। অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যের দুটি ভাগ। আদি বৈদিক সাহিত্য ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য। বৈদিক সাহিত্য থেকেই বৈদিক সভ্যতার ইতিহাস জানা যায়। তাই বৈদিক যুগেরও ভাগ দুটি। *আদি বৈদিক যুগ* ও *পরবর্তী বৈদিক যুগ*। আদি বৈদিক যুগের ইতিহাস জানার একমাত্র উপাদান *ঋকবেদ*। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য থেকে পরবর্তী বৈদিক যুগের ইতিহাস জানা যায়।

মনে রেখো

- ❐ ঋকবেদের সূক্তগুলি ছন্দে বাঁধা ঋক-এর সমষ্টি। তাই ঐ সংহিতার নাম ঋক সংহিতা। সংহিতা কথার অর্থ সংকলন করা।
- ❐ সামবেদ সংহিতার বেশিরভাগটাই ঋকবেদের থেকেই নেওয়া। কেবল সামবেদ সুর করে গানের মতো গাওয়া হতো।
- ❐ যজুর্বেদ মূলত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে দরকারি মন্ত্রের সংকলন। মন্ত্রগুলি কিছুটা পদ্যে ও কিছুটা গদ্যে লেখা।
- ❐ অথর্ববেদ জাদুমন্ত্রের সংকলন। বৈদিক যুগে ও তার পরেও দীর্ঘদিন অথর্ববেদকে সংহিতা বলে ধরা হতো না।
- ❐ সংহিতাগুলিকে ব্যাখ্যা করার জন্য তৈরি হয়েছিল গদ্যে লেখা ব্রাহ্মণ।
- ❐ আরণ্যকগুলি যারা লিখতেন তারা অরণ্যে (বনে) থাকতেন। যাগযজ্ঞের ব্যাখ্যা ও নানা চিন্তাভাবনা আরণ্যক সাহিত্যে দেখা যায়।
- ❐ বেদ-এর নানা তত্ত্বের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও চিন্তাভাবনা উপনিষদে আছে।
- ❐ বৈদিক সাহিত্যগুলিকে ঠিক মতো উচ্চারণ করা, ছন্দ, আসল অর্থ বোঝার জন্য রচনা হয়েছিল বেদাঙ্গ। সংখ্যায় বেদাঙ্গ ছ-টি। এছাড়াও নক্ষত্রের অবস্থান, বিভিন্ন নিয়ম, জ্যামিতির ধারণা প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

বৈদিক সাহিত্য ঠিক কোন সময়ের রচনা তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। মোটামুটিভাবে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যে বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১০০০ অব্দকে আদি বৈদিক যুগ বলে ধরা যায়। তারপর থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত পরবর্তী বৈদিক যুগ। তবে মনে রাখা দরকার, তারপরেও বৈদিক সাহিত্য লেখার কাজ চলেছিল। এখন যে চেহারায় বৈদিক সাহিত্য পাওয়া যায় তা অনেক পরের রচনা।

বেদের ভূগোল

বৈদিক সাহিত্যে পর্বত ও নদীর নাম থেকে উপমহাদেশে আর্যদের বসতির কথা বোঝা যায়। বৈদিক সাহিত্যে বিশেষ করে ঋকবেদে ভূগোল বিষয়ে অনেক আলোচনা রয়েছে। ঋকবেদে হিমালয় (হিমবৎ) ও কাশ্মীরের মূজবন্ত শৃঙ্গের উল্লেখ আছে। বিন্ধ্যপর্বতের উল্লেখ নেই। ঋকবেদে অনেক নদীর কথা বলা হয়েছে। তার থেকে মনে হয় ঐ নদীর কাছাকাছি এলাকাগুলিতেই ছিল আদি

বৈদিক যুগের বসতি। ঋকবেদের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ নদী ছিল সিন্ধু। সরস্বতী নামে যে নদীর কথা ঋকবেদে রয়েছে, তা আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ঋকবেদের মানুষ গঙ্গা ও যমুনা নদীর এলাকার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। ঋকবেদের একেবারে শেষের দিকে মাত্র একবার গঙ্গা ও যমুনা নদীর কথা পাওয়া যায়।

ঋকবেদের ভূগোল থেকে আদি বৈদিক সভ্যতা কতটা ছড়িয়েছিল তা বোঝা যায়। আজকের আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সঙ্গে আদি বৈদিক যুগের মানুষের পরিচয় ছিল। সিন্ধু ও তার পূর্ব দিকের উপনদীগুলি দিয়ে ঘেরা অঞ্চল ছিল আদি বৈদিক মানুষের বাসস্থান। ঐ অঞ্চলটিকে বলা হতো *সপ্তসিন্ধু* অঞ্চল।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের বর্ণনায় ঐ ভূগোল আস্তে আস্তে বদলে গিয়েছিল। গঙ্গা-যমুনা দোয়াব এলাকার উল্লেখ পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অনেক বেশি। এর থেকে বোঝা যায়, বৈদিক-বসতি পাঞ্জাব থেকে পূর্ব দিকে হরিয়ানাতে সরে গিয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে পূর্ব ভারতকে নীচু নজরে দেখা হয়েছে। তার থেকে মনে হয় পরবর্তী বৈদিক সভ্যতার পূর্ব সীমা ছিল উত্তর বিহারের মিথিলা। গঙ্গা নদীর সমভূমি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার ফলে বৈদিক সমাজে কৃষির প্রচলন হয়।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের মূল ভৌগোলিক অঞ্চল ছিল সিন্ধু ও গঙ্গার মাঝের এলাকা। তাছাড়া গঙ্গা উপত্যকার উত্তর ভাগ ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াবও তার ভেতরে পড়ত।

বৈদিকযুগ ও প্রত্নতত্ত্ব

বৈদিক সাহিত্যে তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহারের কথা স্পষ্ট। শেষদিকের রচনায় লোহার ব্যবহারের ধারণা পাওয়া যায়। ঘোড়া ছিল অন্যতম পালিত পশু। ঘোড়ায় টানা রথ ও তির-ধনুকের ব্যবহার ছিল উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। উপমহাদেশের হরপ্পার নাগরিক সভ্যতার অবসানের পরের প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ পাওয়া যায় বিভিন্ন স্থানে। সেগুলি সবই গ্রামীণ সভ্যতার পরিচয় দেয়। এই সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে ঘোড়ার ও পরবর্তী পর্যায়ে লোহার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে মনে রেখো, আগের থেকে আলাদা কোনো নতুন সভ্যতার চিহ্ন মেলে না। একটা মিশ্র বৈশিষ্ট্য এই অঞ্চলগুলিতে দেখা যায়। পরবর্তী বৈদিক যুগে একরকমের মাটির পাত্র বানানো হতো। সেই পাত্রগুলির রং ছিল ধূসর। সেগুলির

টুকরো কথা

মহাকাব্য

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের আরেকটি অংশ হলো **মহাকাব্য**। মহাকাব্য কথার মানে মহৎ বা মহান কাব্য বা কবিতা। কোনো বিশেষ ঘটনা, দেবতা বা বড়ো রাজবংশের শাসককে নিয়েই মহাকাব্য লেখা হতো। তার সঙ্গে থাকত ভূগোল, গ্রহ-নক্ষত্র ও গ্রাম-নগরের কথা। সমাজজীবনের নানা দিক, রাজনীতি, যুদ্ধ, উৎসবের কথাও মহাকাব্যের মধ্যে মিশে থাকত। সাতটি বা অন্তত আটটি সর্গ বা ভাগে ভাগ করা হতো মহাকাব্য। কবির, মূল ঘটনার বা কাব্যের প্রধান চরিত্রের নামে মহাকাব্যের নাম দেওয়া হতো। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে সবথেকে জনপ্রিয় মহাকাব্য ছিল **রামায়ণ** ও **মহাভারত**।

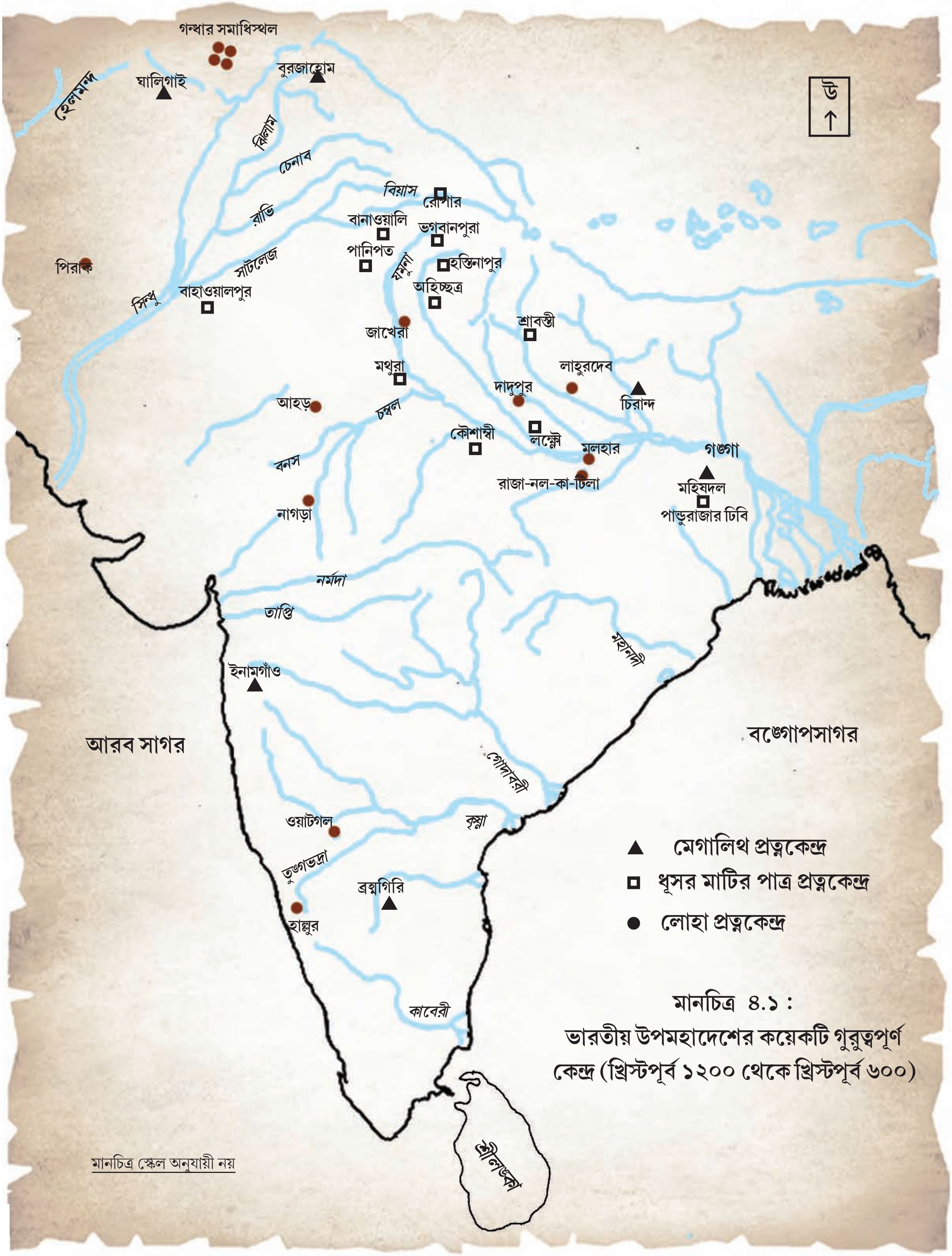

মানচিত্র ৪.১ :
ভারতীয় উপমহাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র (খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০)

গায়ে ছবিও আঁকা হতো। এদের বলা হয় *চিত্রিত ধূসর মাটির পাত্র*। হরিয়ানার ভগবানপুরায় (খ্রি:পূ: ১৬০০-খ্রি:পূ: ১০০০ অব্দ) লোহার ব্যবহারের আগের সময়ের প্রচুর পরিমাণে চিত্রিত ধূসর মাটির বাসন পাওয়া গেছে। এই মাটির পাত্র এলাহাবাদের পূর্বদিকে বিশেষ পাওয়া যায়নি। অত্রঞ্জিখেরা, হস্তিনাপুর, অহিচ্ছত্র, নোহ প্রভৃতি জায়গাগুলোতে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দের পরের সময়ের মাটির বাসন ও লোহার ব্যবহারের প্রমাণ মেলে। এছাড়াও অনেক জায়গায় প্রাচীন গ্রামের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। লোহার তিরের ফলা, বর্শার ফলা, আংটি, পেরেক, ছোরা, বঁড়শি, নানা ধরনের মাটির পাত্র, তামা-ব্রোঞ্জের গয়না, মাটির তৈরি মানুষ ও পশুর মূর্তি পাওয়া গেছে।

???

ভেবে দেখো

হরপ্পার মতো উন্নত পরিকল্পিত নাগরিক সভ্যতার পর বৈদিক গ্রামীণ সভ্যতা গড়ে ওঠার কারণ কী হতে পারে?

৪.৩ বৈদিক রাজনীতি

বৈদিক সাহিত্য মূলত ধর্মীয় সাহিত্য। কিন্তু তার থেকে সেই সময়ের রাজনীতি বিষয়ে বেশ কিছু কথা জানা যায়। ঋকবেদে যুদ্ধে জিতে লুঠপাট চালানোর জন্য দেবতার আশীর্বাদ চাওয়া হয়েছে। আবার পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে শাসকদের জন্য বেশ কিছু যজ্ঞের কথাও রয়েছে। তবে রাজনীতির ঘটনার সরাসরি বর্ণনা বৈদিক সাহিত্যে খুবই কম।

টুকরো কথা

দশ রাজার যুদ্ধ

যুদ্ধের কথা ঋকবেদে অনেক আছে। তার মধ্যে বিখ্যাত হলো **দশ রাজার যুদ্ধ**। ভরত গোষ্ঠীর রাজা ছিলেন সুদাস। তার সঙ্গে অন্যান্য দশটি গোষ্ঠীর রাজাদের যুদ্ধ হয়েছিল। সুদাস দশ রাজার জোটকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে ভরত গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতা বেড়েছিল। নদীর ওপর একটি বাঁধ ভেঙে দিয়েছিলেন সুদাস। হয়তো নদীর জলের উপর অধিকার বজায় রাখার জন্যই এমনটা করা হয়েছিল। এই যুদ্ধের সঙ্গে পরবর্তীকালে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছুটা মিল রয়েছে।

টুকরো কথা

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে রাজা

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের এক জায়গায় রাজা হওয়ার একটা গল্প আছে। দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধে প্রতিবারেই দেবতারা অসুরদের কাছে হেরে যেতেন। চিন্তায় পড়ে দেবতারা জেতার উপায় ঠিক করার জন্য বসেন আলোচনায়। বোঝা যায় কোনো রাজা না থাকার জন্যই দেবতাদের এই পরিণতি।

এবার দেবতারা রাজা খুঁজতে লাগলেন। সবাই একমত হয়ে দেবতাদের মধ্যে সেরা বীর ইন্দ্রকেই রাজা বাছলেন। ইন্দ্র দেখতেও বেশ ভালো ছিলেন। তাই সবাই তাকেই রাজা মেনে নিলেন। এবার কিন্তু দেবতারা ইন্দ্রের নেতৃত্বে জয়ী হতে থাকলেন।

■ উপরের গল্পটি পড়ে ভেবে বলো কেন রাজার দরকার হয়েছিল?

ঋকবেদে *গ্রাম* মানে শুধু গ্রামীণ বসতি নয়। একটি ছোটো জনসমষ্টিকেও *গ্রাম* বলা হয়েছে। আলাদা কয়েকটি পরিবার নিয়ে সম্ভবত ঐ ছোটো জনগোষ্ঠী বা গ্রাম তৈরি হতো। ঋকবেদে *জন, গণ, বিশ* প্রভৃতি শব্দ অনেকবার ব্যবহার হয়েছে। সেগুলি দিয়ে গ্রামের থেকে বড়ো একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হতো। ঋকবেদে যুদ্ধে জেতা ও লুঠপাটের নানান কথা রয়েছে। গবাদি পশু ও ঘোড়া লুঠ হতো সবথেকে বেশি।

ঋকবেদে *রাজা* শব্দের নানান রকম ব্যবহার রয়েছে। *রাজা* কথার আক্ষরিক অর্থ *নেতা*। নেতা যে ধরনের দায়িত্ব সামলাতেন তার ভিত্তিতেই ঠিক হতো তাঁর নাম। রাজাকে *বিশপতি* অর্থাৎ *বিশ* বা গোষ্ঠীর প্রধান বলা হয়েছে। কখনও বা রাজা *গোপতি* বা গবাদি পশুর প্রভু বলে পরিচিত। ঋকবেদে রাজা মানুষ ও জমির দখল পায়নি। তাই *নরপতি* বা *ভূপতি* শব্দগুলির ব্যবহার ঋকবেদে নেই। *বিদথ* নামের একটি প্রতিষ্ঠানের কথা ঋকবেদে রয়েছে। রাজা ও বিশের সদস্যরা বিদথের সদস্য ছিলেন। সেখানে যুদ্ধের কথা আলোচনা হতো। আবার যুদ্ধে লুঠ করা সম্পদের ভাগ-বাঁটোয়ারাও হতো। সেই ভাগাভাগির দায়িত্ব সামলাতেন রাজা। পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজা শাসকে পরিণত হয়। তখন তিনি হলেন *ভূপতি* বা *মহীপতি*। ভূপতি হলেন ভূ অর্থাৎ জমির পতি বা মালিক। মহীপতি হলেন পৃথিবীর রাজা। রাজ্যের প্রজার বা জনগণের প্রধান হিসাবে রাজার উপাধি হলো *নৃপতি* বা *নরপতি*। অর্থাৎ যিনি *নৃ* বা *নর* অর্থাৎ মানুষের রক্ষাকারী। এভাবেই গোষ্ঠীর নেতা হয়ে উঠলেন রাজা। জনগণ পরিণত হলো তাঁর অনুগত প্রজায়। পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজনৈতিক অবস্থা বদলে গিয়েছিল। *ব্রাহ্মণ* সাহিত্যে দেবতা ও অসুরদের লড়াই তারই উদাহরণ।

রাজা যে এলাকাটি শাসন করতেন তাকেই *রাজ্য* বলা হতো। পরবর্তী বৈদিক যুগে উপজাতি বা গোষ্ঠীর নামে অঞ্চলের নাম হতে থাকে। যেমন, কুরু, পাঞ্চাল ইত্যাদি। এভাবে অঞ্চল থেকে প্রাথমিকভাবে রাজ্যের ধারণা গড়ে ওঠে। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের উপর দখল থাকলে তবেই কেউ রাজা হতে পারত। ধরা হতো সেই অঞ্চলের মানুষেরা ঐ রাজার শাসন মেনে চলবে। শাসনকাজ চালানোর জন্য রাজার কিছু কর্মচারী থাকবে। আর থাকবে সেনাবাহিনী।

রাজার কথা এলেই *প্রজা*-র কথাও এসে পড়ে। রাজা যে অঞ্চলে শাসন করতেন সেখানকার বাসিন্দারাই তাঁর *প্রজা*। প্রজা না থাকলে রাজার শাসন চলবে না। প্রজাদের সমস্যা মেটাবেন রাজা। তার বিনিময়ে প্রজারা রাজাকে মেনে চলবে। এটাই ছিল সেকালের নিয়ম।

প্রাচীনকালে রাজা হওয়ার অনেক উপায় ছিল। কেউ যুদ্ধে জিতে রাজা হতেন। আবার কেউবা রাজার ছেলে হিসেবে পরবর্তী রাজা হতেন। কখনও বা গোষ্ঠীর সবাই মিলে নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে রাজা হিসেবে বাছাই করত। রাজারা অনেক সময় পুরোহিতদের পরামর্শে নানান রকম যজ্ঞের আয়োজন করতেন। যেমন, *অশ্বমেধ যজ্ঞ* , *রাজসূয় যজ্ঞ* , *বাজপেয় যজ্ঞ* ইত্যাদি। যুদ্ধে যাওয়ার আগে কিছু যজ্ঞ হতো। যুদ্ধ জিতে ফিরে এসেও যজ্ঞ করতেন রাজারা। যজ্ঞের মধ্যে দিয়ে রাজারা নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতে চাইতেন। শাসকদের জন্য নানারকম যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানের কথা পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বলা হয়েছে।

শাসনের কাজে সাহায্য করতেন যারা, তাদের *রত্নিন* বলা হতো। হয়তো এদের থেকেই পরে মন্ত্রীর ধারণা এসেছে। পরবর্তী বৈদিক যুগে বিদথের কথা পাওয়া যায় না। তার বদলে *সভা* ও *সমিতির* গুরুত্বের কথা জানা যায়। সভাতে বয়স্ক ব্যক্তিরা যোগ দিতেন। গোষ্ঠীর সবাই সম্ভবত সমিতির সদস্য ছিল। সমিতিতে নানারকম রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করা হতো।

বৈদিক সভ্যতার অর্থনীতি ও সমাজ

ঋকবেদে কৃষির তুলনায় পশুপালনের কথা বেশি পাওয়া যায়। আদি বৈদিক সমাজে গবাদি পশুই ছিল প্রধান সম্পদ। যার গবাদি পশু বেশি তিনি ধনী বলে পরিচিত হতেন। পশুপালনের ওপর সমাজ বেশি নির্ভর করত বলেই গবাদি পশুর এত গুরুত্ব ছিল। খেয়াল রাখা দরকার ঋকবেদে যুদ্ধ করে জমি দখলের কথা বিশেষ নেই। কারণ ঋকবেদের যুগে সম্পদ হিসাবে জমির গুরুত্ব বিশেষ ছিল না। তাছাড়া ঘোড়ার চাহিদাও ছিল সম্পদ হিসাবে। আদি বৈদিক যুগে কৃষির প্রসঙ্গ কম হলেও, ছিল। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে যব ছিল প্রধান। গম ও ধান উৎপাদন হতো কিনা তা নিশ্চিত বলা যায় না। আস্তে আস্তে বৈদিক সমাজে কৃষির গুরুত্ব বাড়ছিল।

আদি বৈদিক সমাজে কারিগরি শিল্পের চল ছিল কম। কাঠের কারিগরি শিল্পের কথা জানা যায়। কাঠের আসবাব ও বাড়িঘর তৈরি করা হতো। তাছাড়া রথ তৈরি করতেও কাঠ ব্যবহার হতো। ঋকবেদে চামড়ার শিল্পের কথা রয়েছে। চামড়া দিয়ে থলি, ঘোড়ার লাগাম প্রভৃতি বানানো হতো। ভেড়ার লোম থেকে পোশাক বানানোর কথা ঋকবেদে রয়েছে। টানা ও পোড়েন— দু-রকমের সুতো কাপড় বোনায় ব্যবহার হতো। সোনার নানারকম গয়নার কথাও ঋকবেদ থেকে জানা যায়। তামা দিয়ে চাষের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বানানো হতো। ঋকবেদে লোহার কথা নেই। ফলে আদি বৈদিক সমাজে লোহার ব্যবহার ছিল বলে মনে হয় না।

টুকরো কথা

বেদের যুগে কর দেওয়া-নেওয়া

গোষ্ঠীজীবনে প্রথম দিকে জমির উপর নেতার কোনো অধিকার ছিল না। কিন্তু নেতৃত্ব চালানোর জন্য তাঁর ধনসম্পদের দরকার ছিল। তা সম্ভবত কৃষি থেকেই পেতেন শাসকরা। ঋকবেদের যুগে শাসকরা কর নিতেন। তবে জোর করে করের বোঝা প্রজাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হতো না। প্রজারা নিরাপদে থাকার জন্য স্বেচ্ছায় এক ধরনের কর রাজাকে দিত। ঋকবেদে এই করই **বলি** নামে পরিচিত। তবে পরবর্তী বৈদিক যুগে দলপতি সম্ভবত জোর করে বলি কর আদায় করতেন। অর্থাৎ পরবর্তী বৈদিক যুগে কর হয়ে উঠেছিল বাধ্যতামূলক। যুদ্ধে যাঁরা হেরে যেত তাঁদের থেকেও রাজারা জোর করে কর আদায় করতেন।

পরবর্তী বৈদিক যুগে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে পাকাপাকি কৃষিকাজ শুরু হয়। এই সময় যবের পাশাপাশি গম ও ধান ছিল প্রধান ফসল। কোন ঋতুতে কোন ফসল ফলানো উচিত, তা নিয়েও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে আলোচনা দেখা যায়। লাঙলের ফলা সাধারণত কাঠ বা তামা দিয়ে তৈরি হতো। লোহার লাঙল সম্ভবত তখনও ব্যবহার হতো না।

গঙ্গা অববাহিকায় কৃষিকাজ ও বসতি তৈরির জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করা ছিল দরকারি। সম্ভবত বন পুড়িয়ে ফেলা হতো। আবার লোহার অস্ত্র দিয়ে বন কেটে ফেলাও হতো হয়তো। পরবর্তী বৈদিক সমাজে লোহার ব্যবহার নিশ্চিতভাবেই হতো। লোহার কুড়াল ও কুঠার দিয়ে গঙ্গা উপত্যকার ঘন জঙ্গল সাফ করা সহজ হয়েছিল। লোহার তৈরি লাঙলের ফলা না থাকলেও অস্ত্রশস্ত্র লোহা দিয়েই তৈরি হতো। লোহার অস্ত্র পরবর্তী বৈদিক যুগের শাসকদের সুবিধা করে দিয়েছিল।

লোহা ও অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার কারিগরি শিল্পে উন্নতি ঘটিয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগের চিত্রিত ধূসর মাটির পাত্র প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পেয়েছেন। তার থেকে বোঝা যায় পরবর্তী বৈদিক সমাজে কুমোরের পেশা ছিল। তাছাড়া এসময় কামার, জেলে, রাখাল, চিকিৎসক প্রভৃতি পেশার কথা জানা যায়। গয়না, অস্ত্রশস্ত্র, কাপড় তৈরির শিল্প চালু ছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে কাজের ভাগাভাগি অনেক বেড়ে গেছিল। এমনকি একটি জিনিস বানাতেও আলাদা আলাদা অংশের কারিগর থাকত। যেমন, ধনুক, ধনুকের ছিলা এবং তির তৈরির আলাদা কারিগর ছিল।

আদি বৈদিক যুগে ব্যবসাবাণিজ্যের বিশেষ চলন ছিল না। সরাসরি সমুদ্র-বাণিজ্যের কথা ঋকবেদে নেই। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে ব্যবসাবাণিজ্যের কথা বেশি পাওয়া যায়। তবে সমুদ্র-বাণিজ্য এই আমলেও ছিল কিনা নিশ্চিত জানা যায় না। বৈদিক যুগে জিনিসপত্র বিনিময় করা হতো। তবে মুদ্রার ব্যবহার ছিল বলে মনে হয় না। যদিও *নিষ্ক, শতমান* এগুলি হয়তো মুদ্রার মতো ব্যবহার হতো।

বৈদিক সাহিত্য থেকে ঐ সময়ে সমাজের কথাও জানা যায়। সমাজের সবথেকে ছোটো অংশ ছিল পরিবার। পরিবারের সবথেকে বয়স্ক পুরুষ ছিলেন প্রধান। তাই বৈদিক যুগে সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ পরিবারে ও সমাজে পিতা বা বাবাই ছিলেন প্রধান। হরপ্পার সমাজের মতো মায়ের ক্ষমতা ঋকবৈদিক সমাজে ছিল না।

ঋকবেদে গোড়ার দিকে *বর্ণাশ্রম* বা *চতুর্বর্ণপ্রথা* বিশেষ ছিল বলে জানা যায় না। চারটি বর্ণ বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা ঋকবেদে পাওয়া যায় না। বরং মনে হয় ঋকবেদে *বর্ণ* বলতে গায়ের রংকেই বোঝাত। বর্ণাশ্রম বোঝাতে বর্ণ শব্দের ব্যবহার আদি বৈদিক সমাজে ছিল না। ঋকবেদের সমাজে সামাজিক ভেদাভেদ ছিল। তবে তা বর্ণপ্রথা দিয়ে বিচার করা হতো না। একই পরিবারের সদস্যরা নানা কাজে যুক্ত থাকতেন। ঋকবেদের থেকে এমন একটি পরিবারের কথা জানা যায়। সেখানে বাবা চিকিৎসক, মা শস্য পেশাই করতেন এবং তাদের ছেলে ছিলেন কবি।

ঋকবেদের শেষের দিকে বর্ণাশ্রম প্রথা বোঝাতে বর্ণ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। পরবর্তী বৈদিক সমাজে বর্ণপ্রথা জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে। সেখানে বর্ণ বলতে আর গায়ের রং বোঝাত না। পরবর্তী বৈদিকযুগে চারটি বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই চারবর্ণকে জন্মগত ধরে নিয়ে পেশা ঠিক করা শুরু হতে থাকে। তার থেকেই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি বলে অনেকে মনে করেন।

পুজো, যজ্ঞ, বেদ পাঠ ইত্যাদি করতেন ব্রাহ্মণরা। যুদ্ধ করা, সম্পদ লুঠ করার কাজ ছিল ক্ষত্রিয়দের। কারিগরি, কৃষি ও বাণিজ্য বৈশ্যদের কাজ। এই তিনবর্ণের সেবা করত শূদ্ররা। যুদ্ধবন্দি দাসরাই মূলত শূদ্র ছিল। পরবর্তী বৈদিক আমলে জটিল যাগযজ্ঞ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে বেড়েছিল ব্রাহ্মণদের ক্ষমতাও। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যগুলি ব্রাহ্মণরাই লিখেছিলেন। সেগুলিতে তাই ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ বলেই ঘোষণা করা হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের ঠিক পরেই ছিল ক্ষত্রিয়রা। পরবর্তী বৈদিক সমাজে কৃষিকাজ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সেই সমাজে ক্ষত্রিয়রা আস্তে আস্তে শক্তিশালী হতে থাকে। এমনকি কে বড়ো, তা নিয়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে গোলমাল বাঁধতে শুরু করে।

পরবর্তী বৈদিক সমাজে বৈশ্য ও শূদ্রদের অবস্থা আস্তে আস্তে খারাপ হয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বৈশ্যদের হেয় করে দেখানো হয়েছে। বর্ণব্যবস্থার সবথেকে খারাপ প্রভাব পড়েছিল শূদ্রদের উপর। তাদের কোনো সামাজিক সুযোগসুবিধা প্রায় ছিল না।

টুকরো কথা

সত্যকামের কথা

সত্যকাম তার বাবার পরিচয় জানত না। পড়াশোনার জন্য গুরুর কাছে গেলে গুরু তার গোত্র জানতে চান। সত্যকাম তার মা জবালাকে নিজের গোত্র জানতে চাইলো। জবালা বললেন, 'আমি তা জানি না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তুমি বলবে যে, তুমি সত্যকাম জাবাল।'

সত্যকাম গুরু গৌতমের কাছে গিয়ে বলল, 'আমি আমার গোত্র জানি না। আমার মা বললেন আমার নাম সত্যকাম জাবাল'। গৌতম বললেন, 'তুমি সত্য কথা বলেছো। তাই তোমাকে আমি শিক্ষাদান করব।'

■ ব্রাহ্মণের প্রকৃত পরিচয় কী ছিল? এই অবস্থার কখন কেন পরিবর্তন হয়েছিল বলে মনে হয়?

মনে রেখো

গোষ্ঠীর গবাদিপশু রাখার জায়গাকে বলা হতো **গোত্র**। পরে গোত্রের মানে দাঁড়ায় একই পূর্বপুরুষ থেকে আসা উত্তরাধিকারী। জাতিভেদ প্রথা কঠোর হওয়ার ক্ষেত্রে গোত্রের জরুরি ভূমিকা ছিল।

আদি বৈদিক সমাজে অনেক নারী শিক্ষা লাভ করতেন। এমনকি সমিতির বৈঠকেও কিছু নারী যোগ দিতেন বলে জানা যায়। যুদ্ধেও তারা অংশ নিতেন। ঋকবেদে কোথাও বাল্যবিবাহের কথা নেই। সতীদাহ প্রথার কথাও সেখানে পাওয়া যায় না। যজ্ঞেও নারীরা অংশ নিতে পারতেন।

পরবর্তী বৈদিক সমাজে নারীদের অবস্থাও খারাপ হয়েছিল। মেয়ে জন্মালে পরিবারে সবাই দুঃখ পেত। ছোটো বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার প্রথা শুরু হয়েছিল। যুদ্ধে বা সমিতির কাজে মেয়েদের আর যোগ দিতে দেখা যেত না।

বৈদিক সমাজে পাশাখেলা ছিল খুব জনপ্রিয়। সভা ও সমিতিতেও পাশা খেলা হতো। রথ ও ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা দেখতে মানুষ ভিড় করত। গানবাজনারও প্রচলন ছিল বৈদিক সমাজে। যব, গম ও ধান ছিল প্রধান খাদ্যশস্য। আদি বৈদিক সমাজে নানারকম মাংস খাওয়ারও প্রচলন ছিল।

টুকরো কথা

চতুরাশ্রম

পরবর্তী বৈদিক যুগে জীবনযাপনের চারটি ভাগ বা পর্যায় ছিল। *ব্রহ্মচর্য*, *গার্হস্থ্য*, *বাণপ্রস্থ* এবং *সন্ন্যাস*। ছাত্রাবস্থায় গুরুগৃহে থেকে শিক্ষালাভ করা ছিল *ব্রহ্মচর্যাশ্রম*। শিক্ষালাভের পর বিয়ে করে সংসার জীবন যাপনকে বলা হতো *গার্হস্থ্যাশ্রম*। *বাণপ্রস্থা-শ্রম বলা হতো* সংসার থেকে দূরে বনে কুটির বানিয়ে ধর্মচর্চা করাকে। সবকিছু ভুলে ঈশ্বরচিন্তায় শেষ জীবন কাটানোকে বলা হতো *সন্ন্যাস আশ্রম*। এই চারটি পর্যায়কে একসঙ্গে *চতুরাশ্রম* বলা হতো। শূদ্রদের এই জীবনযাপনের অধিকার ছিল না।

টুকরো কথা

বৈদিক সমাজ ও ধর্ম

বৈদিক যুগে মূর্তি পুজো প্রচলিত ছিল না। কিন্তু দেবদেবীর মূর্তি কল্পনা করা হতো মানুষের মতন। কোনো মন্দিরের উল্লেখ নেই বৈদিক সাহিত্যে। ধর্মচর্চা মূলত ছিল আচার অনুষ্ঠান নির্ভর এবং যজ্ঞকেন্দ্রিক। যজ্ঞে গোরু, ঘোড়া ইত্যাদি পশু বলি দেওয়া হতো। ঋকবেদের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি সূর্য, মিত্র, অশ্বিনীদ্বয়, সোম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ঊষা, সরস্বতী, অদিতি, পৃথিবী প্রভৃতি ছিলেন উল্লেখযোগ্য দেবী। যুদ্ধের ও বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র ঋকবৈদিক যুগের প্রধান দেবতা। সূর্যদেবতা সবিতৃ-র উদ্দেশ্যে গায়ত্রী মন্ত্র রচিত হয়েছিল।

পরবর্তী বৈদিক যুগে রুদ্র ও বিষ্ণু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। যজ্ঞ ও আচার অনুষ্ঠান অনেক গুণ বেড়ে যায়। যজ্ঞে অনেক পশু হত্যা করা হতো। যজ্ঞে দান করা হতো পশু, সোনা ও জমি। পুরোহিত বা ব্রাহ্মণরা এভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে ধর্মীয় আচার-নিয়মের জন্য। বৈদিক ধর্ম ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্যধর্মের রূপ নিতে লাগল। তবে উপনিষদে নিরাকার এক-ঈশ্বরের ভাবনা পাওয়া যায়।

বৈদিক যুগের শিক্ষা

বৈদিক সাহিত্য থেকেই সেই যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার ধারণা আমরা পাই। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন গুরু। মৌখিকভাবেই শিক্ষার চর্চা হতো। গুরু একটা অংশ পড়ে তার মানে বুঝিয়ে দিতেন। ছাত্ররা সেই পুরোটা শুনে আবৃত্তি করত ও মনে রাখত। মুখস্থ করার ক্ষেত্রে সঠিক উচ্চারণের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হতো। বৈদিক যুগের কোনো লিপির খোঁজ প্রত্নতাত্ত্বিকরা পাননি।

পরবর্তী বৈদিক যুগে শিক্ষার সঙ্গে উপনয়নের সম্পর্ক দেখা যায়। ছাত্র শিক্ষা নেওয়ার জন্য গুরুর কাছে আবেদন করত। উপযুক্ত মনে করলেই উপনয়ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গুরু সেই ছাত্রকে শিষ্য হিসেবে মেনে নিতেন। মেয়েদেরও যে উপনয়ন হতো তারও বেশ কিছু প্রমাণ দেখা যায়। গুরুর কাছে থেকেই ছাত্ররা শিক্ষা লাভ করত। সেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য কাজকর্মও ছাত্রদের করতে হতো। ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব ছিল গুরুর উপরে।

টুকরো কথা

বৈদিক পড়াশোনা ও শ্রুতি

বৈদিক সাহিত্য মূলত শুনে শুনে মনে রাখতে হতো। তাই বেদের আরেক নাম **শ্রুতি**। ঋকবেদে ভেকস্তুতি বলে একটা অংশ আছে। সেখানে বলা আছে একটি ব্যাং ডাকলে অন্যান্য ব্যাং তার মতোই ডাকতে থাকে। ঠিক তেমনি ঋকবেদের সূক্তগুলি মনে করে গুরু বা একজন শিক্ষার্থী আবৃত্তি করত। বাকিরা শুনেশুনে মনে রেখে সেটাই নিখুঁতভাবে বলত। সেকারণে নির্ভুল উচ্চারণ করে বৈদিক মন্ত্রগুলি বলার দক্ষতা অর্জন করতে হতো। তাই **ছন্দ ও ব্যাকরণ** বৈদিক শিক্ষার দুটি প্রধান বিষয় ছিল।

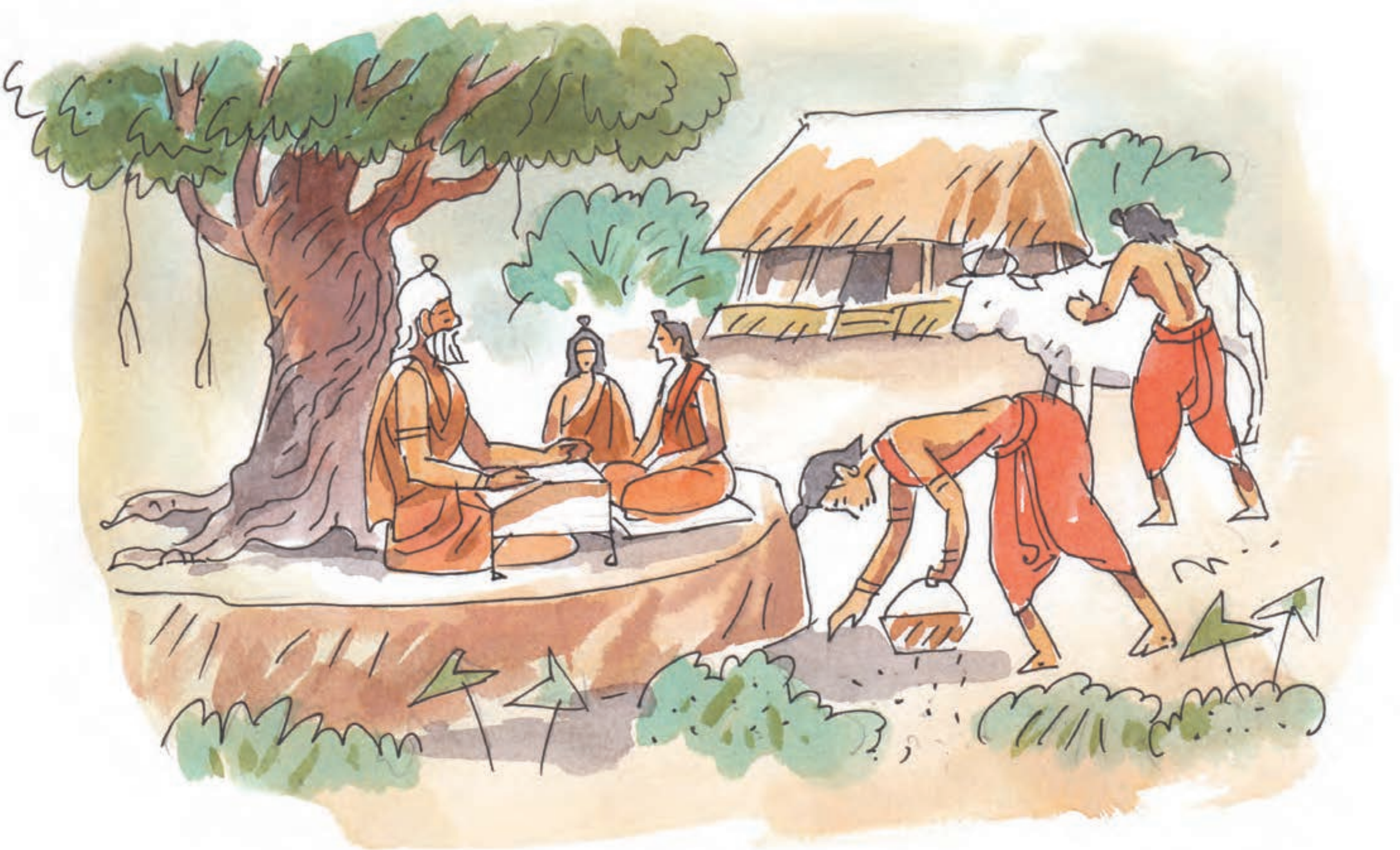

টুকরো কথা

আরুণির কথা

মহর্ষি আয়োদধৌম্য ছিলেন একজন আদর্শ গুরু। তাঁর তিনজন বিখ্যাত ছাত্র ছিল। বেদ, উপমন্যু ও আরুণি। গুরুভক্তি পরীক্ষা করার জন্য আয়োদধৌম্য তাঁর শিষ্যদের নানা কঠিন কাজ দিতেন। একদিন তিনি আরুণিকে ক্ষেতের জল বের হওয়া জায়গায় আল বাঁধতে বললেন। আরুণি আল বাঁধার অনেক চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ক্ষেতের সব জল ঐ জায়গা দিয়েই বার হয়। তাই আল বাঁধা মুশকিল হলো। এদিকে গুরুর আদেশ পালনের জন্য আরুণিকে জলস্রোত আটকাতে হবেই। তখন আরুণি নিরুপায় হয়ে আলের উপর নিজে শুয়ে পড়ল। সেভাবেই নিজের শরীর দিয়ে জলস্রোত আটকে রাখতে চেষ্টা করল। আরুণির ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে মহর্ষি তার খোঁজে ক্ষেতে এসে পৌঁছোলেন। গুরুর ডাক শুনে আরুণি ক্ষেত থেকে উঠে গেল। আয়োদধৌম্য আরুণির মুখে সব শুনে শিষ্যের গুরুভক্তিতে খুব খুশি হলেন। ক্ষেতের আল বা কেদারখণ্ড ভেদ করে আরুণি উঠে এসেছিল বলে মহর্ষি তার নাম দিলেন উদ্দালক। উদ্দালক নিজেও পরে খুব বিখ্যাত গুরু হয়েছিলেন।

বেদপাঠ করানোর মধ্যে দিয়েই শিক্ষাদান করা হতো। তার সঙ্গে গণিত, ব্যাকরণ ও ভাষাশিক্ষার উপরও জোর দেওয়া হতো। হাতেকলমে অনেক কিছুই শিখতে হতো। ছাত্রদের নিজেকে রক্ষা করা ও অস্ত্রচালানো শিখতে হতো। এমনকি ব্রাহ্মণরাও অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করত। যেমন, *মহাভারত* থেকে দ্রোণাচার্য, কৃপ, পরশুরামের কথা জানা যায়। ছাত্ররা চিকিৎসা করা শিখত। মেয়েরা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নাচ ও গানের চর্চা করত।

???

ভেবে দেখো

তোমরা পড়াশোনার সঙ্গে হাতেকলমেও কি কাজ শেখো? হাতেকলমে কী কী শিখেছ?

সাধারণত বারো বছর ধরে শিক্ষা গ্রহণ চলত। অনেকে আবার জীবনভরই ছাত্র থাকত। এমনিতে বারো বছরের পড়াশোনা শেষ হলে *সমাবর্তন* অনুষ্ঠান হতো। সেই অনুষ্ঠানে ছাত্রদের *স্নাতক* বলে ঘোষণা করা হতো। পড়াশোনার শেষে ছাত্রদের বিশেষ স্নান করার প্রথা ছিল। তার থেকেই *স্নাতক* কথাটা এসেছে। গুরুগৃহ ছেড়ে চলে যাবার আগে ছাত্ররা সাধ্যমতো গুরুদক্ষিণা দিত। গুরুদক্ষিণা হিসাবে গোরুদান করার কথা জানা যায়।

টুকরো কথা

একলব্য

ভিলদের রাজা ছিলেন হিরণ্যধনু। তাঁর একমাত্র ছেলের নাম একলব্য। একলব্য খুবই সাহসী ও পরিশ্রমী। একলব্যের ইচ্ছা হলো সে তির ছুঁড়তে শিখবে। সে শুনেছে গুরু দ্রোণাচার্য খুব বড়ো অস্ত্র-শিক্ষক।

ঘরে ফিরে বাবাকে দ্রোণাচার্যের বিষয়ে জানতে চাইল একলব্য। হিরণ্যধনু বললেন, ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য শুধু ক্ষত্রিয় বালকদেরই অস্ত্র শিক্ষা দেন। ভিল বালককে কিছুতেই আচার্য দ্রোণ নিজের শিষ্য করবেন না। সেকথা শুনে একলব্য বলল, তির ছোঁড়া শুধু আচার্য দ্রোণের কাছেই শিখব।

দ্রোণের কুটিরে গিয়ে একলব্য তাঁকে প্রণাম করে তারপরে নিজের পরিচয় দিল। দ্রোণকে বলল, আপনার কাছে তির ছোঁড়ার শিক্ষা নিতে এসেছি। আমায় আপনার শিষ্য করে নিন গুরুদেব। দ্রোণ ভালো করে বুঝিয়েই বললেন, আমি তোমাকে শিষ্য করতে পারব না। আমি শুধু ক্ষত্রিয়দেরই অস্ত্র-শিক্ষা দিই। তুমি ভিলকুমার। ঘরে ফিরে যাও।

টুকরো কথা

বৈদিক পড়াশোনা ও বিজ্ঞানচর্চা

বৈদিক শিক্ষায় গণিতের চর্চা হতো। যজ্ঞবেদি বানানোর জন্য জ্যামিতির জ্ঞান প্রয়োজন হতো। যজ্ঞবেদির ইট পোড়ানো হতো। ঠিক মতো ইট বানানো ও পোড়ানোর দায়িত্ব পড়ত ইটের কারিগরদের ওপর। আর যজ্ঞবেদি বানাত মিস্ত্রি আর স্থপতিরা। ফলে স্থপতিদের হাতেই বৈদিক গণিতচর্চা শুরু হয়েছিল। যজ্ঞের বেদি তৈরিতে শ্রমিক, ছুতোর, গণিতবিদদের দরকার হতো। তবে ঋকবেদে ইটের কথা নেই। সেকথা প্রথম পাওয়া যায় যজুর্বেদে। যজ্ঞের বেদি তৈরির জন্য বিভিন্নরকম যন্ত্রের ব্যবহার হতো। যজ্ঞ করার জন্য গ্রহ-নক্ষত্র ও কাল, ঋতুর সঠিক ধারণা দরকার ছিল। সেই চর্চা থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে জানা-বোঝা শুরু হয়। অথর্ববেদের একটা অংশে চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়েও আলোচনা দেখা যায়।

খুব মন খারাপ হয়ে গেল একলব্যর। দ্রোণের কুটির থেকে বেরিয়ে ঘরের দিকে ফিরল না। জঙ্গলে গিয়ে সে মাটি দিয়ে আচার্য দ্রোণের একটা মূর্তি তৈরি করল। আর একাই ঐ মূর্তির সামনে তির ছোঁড়া অভ্যাস করতে লাগল। একটানা অভ্যাস চালিয়ে গেল একলব্য। এভাবে অনেকদিন পর সে সত্যিই বিরাট তিরন্দাজ হয়ে উঠল।

একদিন সেই মূর্তির সামনে একলব্য তির ছোঁড়া অভ্যাস করছে। হঠাৎ একটা কুকুরের চিৎকারে তার মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে তির ছুঁড়ে কুকুরটার মুখ আটকে দিল একলব্য। সেই অবস্থায় কুকুরটা দৌড়ে চলে গেল কৌরব ও পাণ্ডব রাজকুমারদের কাছে। কুকুরের অবস্থা দেখে তারা বুঝল এভাবে তির মারা আশ্চর্যের ব্যাপার। অর্জুনও এত অসাধারণ তির ছুঁড়তে পারে না। দ্রোণাচার্য চমকে উঠলেন কুকুরটাকে দেখে। তিনি মনে মনে ঐ তিরন্দাজের তারিফ করলেন।

কিছুদূর গিয়েই দ্রোণ দেখলেন একলব্য তির ছোঁড়া অভ্যাস করছে। তিনি একলব্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার গুরু কে? একলব্য জানাল, আচার্য দ্রোণ আমার গুরু। তখন একলব্য সবাইকে দ্রোণাচার্যের মূর্তিটা দেখাল। দ্রোণ একলব্যের পরিশ্রম ও শেখার আগ্রহ দেখে খুবই খুশি হলেন। অথচ অর্জুনকে তিনি কথা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাকেই পৃথিবীর সেরা ধনুর্ধারী বানাবেন। কিন্তু একলব্য অর্জুনকেও ছাড়িয়ে গেছে। নিজের কথার খেলাপ হবে ভেবে দ্রোণ একটা উপায় ঠিক করলেন।

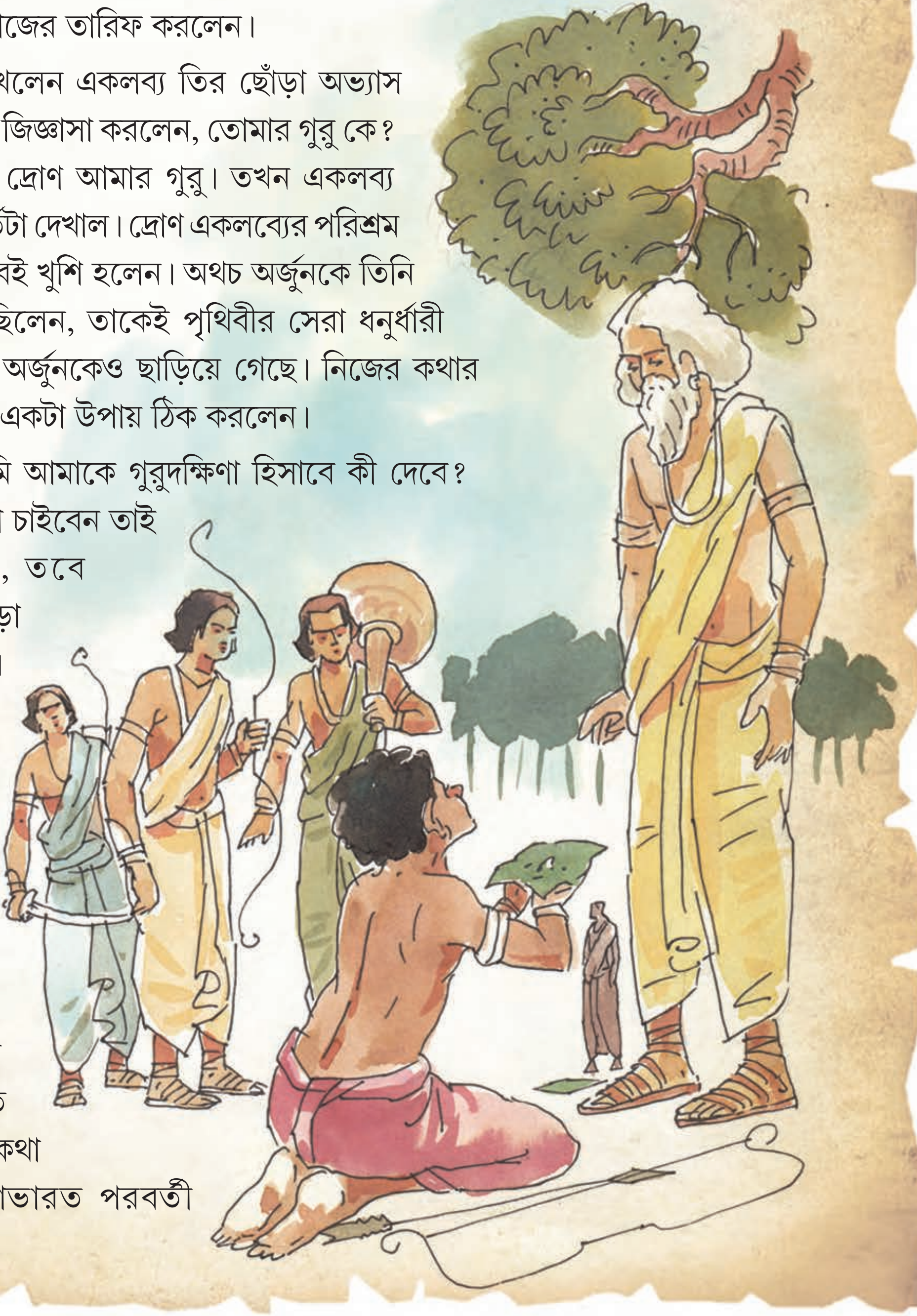

একলব্যকে বললেন, তুমি আমাকে গুরুদক্ষিণা হিসাবে কী দেবে? একলব্য বলল, আপনি যা চাইবেন তাই দেবো। দ্রোণ বললেন, তবে তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা আমায় দাও। নিজের ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা কেটে দ্রোণকে দিয়ে দিল একলব্য।

এরপর একলব্য তার ডান হাতের বুড়ো আঙুল ছাড়াই তির ছুঁড়তে শিখেছিল। তবু আগের মতো সে আর তির ছুঁড়তে পারতো না। একলব্যের কথা মহাভারতে আছে। মহাভারত পরবর্তী বৈদিক যুগের রচনা।

৪.৪ বৈদিক যুগে অন্যান্য সমাজ

পুরো ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে বৈদিক সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েনি। সিন্ধু ও গঙ্গা নদীর উপত্যকা অঞ্চলেই বৈদিক বসতি ছিল। পূর্ব, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ অংশে বৈদিক সভ্যতা ছিল না। উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে ঐসময়ে অন্যরকম সংস্কৃতির খোঁজ পেয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। সেই সংস্কৃতিগুলিতে মানুষ পাথর ও তামার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। কালো ও লাল রঙের মাটির পাত্র তারা ব্যবহার করত। মাটির তৈরি ভাঙা বাড়িঘরও খুঁজে পেয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। পশ্চিমবঙ্গে মহিষদলে তেমনই একটি সংস্কৃতির খোঁজ পাওয়া গেছে। সেখানে গ্রামীণ কৃষিসমাজ ছিল বলে জানা যায়। তারা মৃতদেহকে সমাধি দিত। এমনই একটি সমাজের খোঁজ পাওয়া গেছে মহারাষ্ট্রের ইনামগাঁওতে।

ভেবে দেখো

লোহা ও ঘোড়ার ব্যবহার শুরু হওয়ার ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে কী কী বদল ঘটেছিল বলে তোমার মনে হয়?

মেগালিথ

মেগালিথ হলো বড়ো পাথরের সমাধি। প্রাচীন ভারতে লোহার ব্যবহারের সঙ্গে এই সমাধির সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠী বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে পরিবারের মৃত ব্যক্তিদের সমাধি চিহ্নিত করত। বড়ো পাথর দিয়ে চিহ্নিত এই সমাধিগুলোর নানা রকমফের দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা বড়ো একটি পাথর। কোথাও বৃত্তাকারে সাজানো অনেক পাথর। কোথাও অনেকগুলো পাথর ঢাকা দেওয়া রয়েছে একটা বড়ো পাথর দিয়ে। কোথাওবা পাহাড় কেটে বানানো গুহার ভেতর সমাধি। এইসব সমাধিগুলো থেকে মানুষের কঙ্কাল ও তাদের ব্যবহারের জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। কাশ্মীরের বুরজাহোম, রাজস্থানের ভরতপুর, ইনামগাঁও বিখ্যাত মেগালিথ কেন্দ্র। তবে এই বড়ো পাথরের সমাধিগুলো বেশি পাওয়া যায় দক্ষিণ ভারতে। এইসব জায়গায় কালো বা লাল মাটির বাসন, পাথর, পোড়ামাটির তৈরি জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। তাছাড়া লোহা, সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জের জিনিসও রয়েছে। ঘোড়া ও অন্যান্য জীবজন্তুর হাড়, মাছের কাঁটা ইত্যাদিও পাওয়া গেছে। ব্যবহার করা জিনিসের তফাত থেকে বোঝা যায় ঐসব সমাজে ধনী-দরিদ্র ভাগ ছিল। জানা যায় যে, কোনো কোনো জায়গায় একসঙ্গে একটি পরিবারের সমাধি দেওয়া হতো।

ছবি. ৪.১: একটি মেগালিথ

মনে রেখো

ছোটোনাগপুরে মুণ্ডা, আসামে খাসিদের মধ্যে মেগালিথ ব্যবস্থা এখনও রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, হুগলি ও পুরুলিয়ায় এমন সমাধিক্ষেত্র দেখা যায়।

টুকরো কথা

এক নজরে ইনামগাঁও

- ✶ মহারাষ্ট্রের পুণে জেলার একটি প্রত্নক্ষেত্র। একটি মেগালিথ কেন্দ্র।
- ✶ ভীমা নদী উপত্যকার এই কেন্দ্রে খ্রি:পূ: ১৪০০ থেকে খ্রি:পূ: ৬০০ অব্দ সময়কালের মানুষের বাস ছিল।
- ✶ কৃষি, পশুপালন ও মৎস্যশিকার ছিল তাদের প্রধান জীবিকা।
- ✶ আয়তাকার প্রায় ১৩৪ টি ঘরের খোঁজ পাওয়া গেছে।
- ✶ ৬ মিটার চওড়া, ৪২০ মিটার লম্বা একটি সেচখালের অবশেষ পাওয়া গেছে।
- ✶ গম, যব, ডাল ও ধান ছিল প্রধান উৎপন্ন খাদ্যশস্য।
- ✶ বাড়িতে শস্য মজুত রাখার জালা, আগুন জ্বালাবার গর্ত পাওয়া গেছে। বাড়ির লাগোয়া সমাধিক্ষেত্রও পাওয়া গেছে।
- ✶ দামি পাথরের হার পরা দু-বছরের বাচ্চা মেয়ের সমাধি পাওয়া গেছে।
- ✶ পাত্রের গায়ে পাওয়া গেছে ষাঁড়ে টানা গাড়ির ছবি।
- ✶ মাথাসমেত ও মাথা ছাড়া দুটি দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে।
- ✶ প্রতিটি বাড়িতেই মাটির পাঁচিল, মাংস ঝলসাবার জন্য উনুন ছিল।
- ✶ শেষপর্বে আয়তাকার বাড়ির বদলে ছোটো গোলাকার কুঁড়ে তৈরি হতে থাকে।
- ✶ কালো ও লাল মাটির বাসনপত্র, লোহার জিনিস ইত্যাদি পাওয়া গেছে।
- ✶ পরের দিকে ঘোড়ার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।
- ✶ পাঁচটি ঘরওলা একটি বড়ো বাড়িতে উত্তরে মাথা করা একটি সমাধি পাওয়া গেছে। হয়তো সেটা ছিল গোষ্ঠীপতির সমাধি।

ছবি. ৪.২: মেগালিথ কেন্দ্র

ভেবে দেখো খুঁজে দেখো

১। সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

১.১) আদি বৈদিক যুগের ইতিহাস জানার প্রধান উপাদান— (জেন্দ অবেস্তা/মহাকাব্য/ঋকবেদ)।

১.২) মেগালিথ বলা হয়— (পাথরের গাড়ি/পাথরের সমাধি/পাথরের খেলনা) কে।

১.৩) ঋকবেদে রাজা ছিলেন—(গোষ্ঠীর প্রধান/রাজ্যের প্রধান/সমাজের প্রধান)।

১.৪) বৈদিক সমাজে পরিবারের প্রধান ছিলেন — (রাজা/বিশপতি/বাবা)।

২। বেমানান শব্দটি খুঁজে লেখো :

২.১) ঋকবেদ, মহাকাব্য, সামবেদ, অথর্ববেদ

২.২) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, নৃপতি

২.৩) ইনামগাঁও, হস্তিনাপুর, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী

২.৪) ঊষা, অদিতি, পৃথিবী, দুর্গা

৩। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :

৩.১) বেদ শুনে শুনে মনে রাখতে হতো। এর কারণ কী বলে তোমার মনে হয়?

৩.২) বৈদিক সমাজ চারটি ভাগে কেন ভাগ হয়েছিল বলে তোমার মনে হয়?

৩.৩) বৈদিক যুগের পড়াশোনায় গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক কেমন ছিল বলে মনে হয়?

৩.৪) আদি বৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীর অবস্থার কি কোনো বদল হয়েছিল? বদল হয়ে থাকলে কেন তা হয়েছিল বলে মনে হয়?

৪। হাতেকলমে করো :

৪.১) বৈদিক সমাজে রাজার ধারণার বদল একটি চার্টের সাহায্যে দেখাও।

৪.২) বৈদিক সমাজে জীবিকাগুলির একটি চার্ট তৈরি করো।

৫

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ভারতীয় উপমহাদেশ

রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ধর্মের বিবর্তন - উত্তর ভারত

একটু থেমে রুবির দাদু জানতে চাইলেন, তোমরা রূপকথার গল্প নিশ্চয়ই পড়েছ? আজ দাদু ওদের রূপকথার গল্প শোনাচ্ছেন। যদিও ওরা ক্লাস সিক্সে পড়ে, তবুও রূপকথার গল্প শোনার মজাই আলাদা। কত রাজা, রানি, রাজপুত্র, রাজকন্যা। সঙ্গে আছে পক্ষীরাজ ঘোড়া, তেপান্তরের মাঠ। সবমিলিয়ে বেশ জমজমাট। কিন্তু রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে পলাশের মনে একটা ভাবনা আসে। রূপকথায় রাজার নাম থাকে না। সেই রাজা *কবে*, *কোথায়* ছিলেন তাও বলা থাকে না। দিদিমণি বলেছিলেন, রূপকথা ইতিহাস নয়। পলাশের খুব জানতে ইচ্ছা করে ইতিহাসের রাজা-রানিদের কথা। পরদিন ক্লাসে সেই ইচ্ছার কথাই জানাল পলাশ। দিদিমণি বললেন, বেশ তো, এবারে তাহলে রাজার কথাই হোক।

৫.১. জনপদ থেকে মহাজনপদ

প্রাচীন ভারতে গ্রামের থেকে বড়ো অঞ্চলকে *জন* বলা হতো। সেই *জন*-কে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছিল ছোটো ছোটো রাজ্য। এইভাবে *জন* শব্দ থেকেই *জনপদ* শব্দটি এসেছিল। আরেক দিক থেকে সাধারণ মানুষ বা জনগণ যেখানে বাস করত তাকে বলা হতো *জনপদ*। অর্থাৎ জনগণ যেখানে পা বা *পদ* রাখেন, সেটাই *জনপদ*। কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় জনগণ পাকাপাকিভাবে বাস করতে থাকলে তা *জনপদ* হয়ে ওঠে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে এইরকম অনেকগুলি জনপদের কথা জানা যায়। সেসব জনপদগুলি অনেক সময়েই পরিচিত হতো সেখানকার শাসক বংশের নামে। ঐ জনপদগুলিকে ভিত্তি করেই পরের দিকে বড়ো বড়ো রাজ্য তৈরি হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকরা ভারতীয় উপমহাদেশের কয়েকটি জায়গায় মাটি খুঁড়ে এরকম জনপদের খোঁজ পেয়েছেন। মগধের মতো কয়েকটি জনপদ আস্তে আস্তে মহাজনপদে পরিণত হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ একেকটা জনপদের ক্ষমতা ক্রমে বাড়তে থাকে। সেখানকার শাসকরা যুদ্ধ করে নিজেদের রাজ্যের সীমানা বাড়াতে থাকেন। ছোটো ছোটো জনপদগুলির কয়েকটি পরিণত হয় বড়ো রাজ্যে। এই বড়ো রাজ্যগুলিই *মহাজনপদ* বলে পরিচিত হয়। জনপদের থেকে যা আয়তন ও ক্ষমতায় বড়ো তাই *মহাজনপদ*। মহাজনপদগুলির শাসকরা ছিলেন বৈদিক যুগের রাজাদের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী। তাঁদের হাতে অনেক সম্পদ জমা হলো। সেই সম্পদ ব্যবহার করে তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা আরো বাড়াতে চাইলেন। ফলে প্রায়শই লেগে থাকত যুদ্ধ।

ষোড়শ মহাজনপদ

জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যেও জনপদ-মহাজনপদের আলোচনা পাওয়া যায়। সেগুলি থেকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে ষোলোটি মহাজনপদের কথা জানা যায়। সেইসময়ে এদেরকে একসঙ্গে *ষোড়শ মহাজনপদ* বলা হতো। মহাজনপদগুলির মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত। একে অন্যের রাজ্য জয় করে নিজেদের রাজ্যের সীমানা বাড়াতে চাইত। এইভাবে ক্রমে ষোলোটা মহাজনপদ কমতে কমতে চারটে মহাজনপদে এসে দাঁড়াল। এগুলি হলো অবন্তী, বৎস, কোশল ও মগধ। এই চারটে মহাজনপদ আবার নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করত। তাদের মধ্যে শেষপর্যন্ত মগধ হয়ে ওঠে সবথেকে বেশি শক্তিশালী।

ষোলোটি মহাজনপদের বেশিরভাগই ছিল আজকের মধ্য ও উত্তর ভারত অঞ্চলে। দক্ষিণ ভারতের একমাত্র মহাজনপদ ছিল অস্মক। মানচিত্র (৫.১) থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গঙ্গা-যমুনার উপত্যকাকে ভিত্তি করেই বেশিরভাগ মহাজনপদ গড়ে উঠেছিল। গঙ্গা নদীর উপত্যকা অঞ্চল ছিল সেই সময়ের ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনীতির মূল কেন্দ্র।

বিরাট গঙ্গা উপত্যকা ছিল একটি সমতল অঞ্চল। ফলে রাজ্য জয়ের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বাধা ছিল না। যথেষ্ট বৃষ্টি হওয়ার ফলে পলিমাটির জমি ছিল উর্বর। চাষ হতো খুবই ভালো। পাশাপাশি গভীর বনও ছিল। বনে কাঠ থেকে হাতি সবই পাওয়া যেত। নদীপথে যাতায়াত করারও সুবিধা ছিল। এসবের ফলেই ঐ অঞ্চলের মহাজনপদগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

মহাজনপদের শাসন ব্যবস্থা

অধিকাংশ মহাজনপদেই ছিল রাজার শাসন। সেই মহাজনপদগুলিকে বলা হতো রাজতান্ত্রিক রাজ্য। রাজতান্ত্রিক রাজ্যগুলিতে শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে উপরে ছিলেন রাজা। রাজা বিশেষ কোনো বংশের সদস্য ছিলেন। সেই বংশই বছরের পর বছর রাজত্ব করত। একসময়ে তাদের হারিয়ে অন্য বংশের কেউ আবার রাজা হতেন। শাসনের কাজে রাজাকে সাহায্য করত একটি সভা। তার সদস্যরা রাজাকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। রাজ্যগুলিতে জমি জরিপ করে কর সংগ্রহ করা হতো। কর থেকে পাওয়া টাকায় রাজ্যের শাসন কাজের খরচ চলত।

এরকম একটি রাজতান্ত্রিক মহাজনপদ ছিল মগধ। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের আগে মগধ ছিল দক্ষিণ বিহারের একটি সামান্য এলাকা। কিন্তু দক্ষ রাজাদের নেতৃত্বে মগধ আস্তে আস্তে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে ওঠে। সেকালে মগধ বলতে এখনকার বিহারের পাটনা ও গয়া জেলাকে বোঝাত। মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ। পরে পাটলিপুত্র রাজধানী হয়ে যায়।

মগধ রাজ্য নদী ও পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছিল। ফলে বাইরের আক্রমণ থেকে মগধ সহজেই বেঁচে যেতে পারত। গঙ্গা নদীর পলিমাটি ঐ অঞ্চলের কৃষিজমিকে উর্বর করে তুলেছিল। মগধ অঞ্চলের ঘন বনগুলিতে অনেক হাতি পাওয়া যেত। সেই হাতিগুলি মগধের রাজারা যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করতেন। পাশাপাশি সেখানে অনেকগুলি লোহা ও তামার খনি ছিল। ফলে মগধের রাজারা সহজেই লোহার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে পারতেন। জল ও স্থলপথে মগধের বাণিজ্য চলত। এসব সুবিধার ফলে মগধই শেষপর্যন্ত সবথেকে শক্তিশালী মহাজনপদে পরিণত হয়।

কয়েকটি মহাজনপদ ছিল অরাজতান্ত্রিক। সেখানে কোনো রাজার শাসন ছিল না। সেগুলিকে বলা হতো *গণরাজ্য*। এরকম দুটি গুরুত্বপূর্ণ গণরাজ্য ছিল মল্ল ও বজ্জি বা বৃজি। সাধারণভাবে গণরাজ্যগুলিতে একেকটি উপজাতি বাস করত। তারা নিজের নিজের রাজ্যে অরাজতান্ত্রিক শাসন বজায় রেখেছিল।

মানচিত্র ৫.১ : ষোড়শ মহাজনপদ (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক)

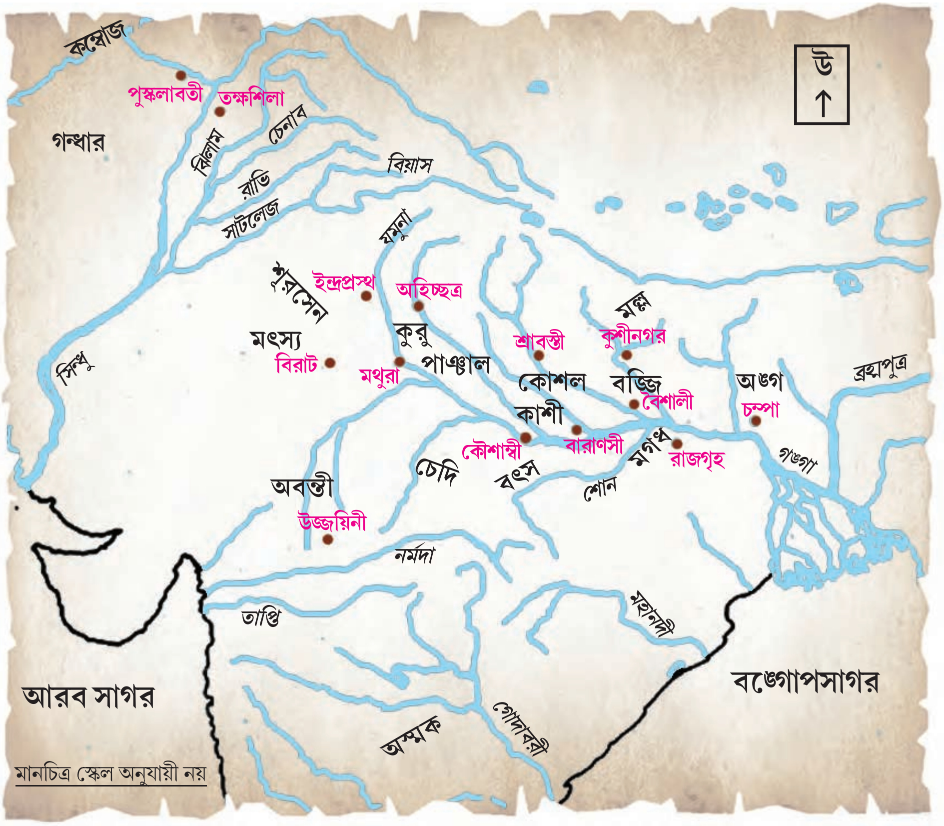

গণরাজ্যগুলিতে জনগণ সবাই মিলে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে কর্তব্য ঠিক করতেন। অবশ্য নারী ও দাসেরা ঐ আলোচনায় অংশ নিতে পারতেন না।

রাজতান্ত্রিক মহাজনপদগুলি গণরাজ্যগুলিকে দখল করতে চাইত। গণরাজ্যগুলির মধ্যে তিনটি রাজ্য স্বাধীন থেকে গিয়েছিল। বজ্জিদের রাজ্য ও মল্লদের দুটি রাজ্য— পাবা ও কুশিনারা। এদের মধ্যে বজ্জিদের শক্তি সবচেয়ে বেশি ছিল। বজ্জি মহাজনপদটি ছিল মগধের খুব কাছেই। বজ্জির শাসন ক্ষমতা ছিল কয়েকটি গোষ্ঠীর হাতে।

গৌতম বুদ্ধের সময় বজ্জিরা একজোট ও স্বাধীন ছিল। বুদ্ধ নিজেও বজ্জিদের সম্মান করতেন। বজ্জিদের রাজধানী ছিল বৈশালী। বৈশালীর আশেপাশে যেসব বজ্জি থাকত তাদের বলা হত লিচ্ছবি। গৌতমবুদ্ধ বজ্জিদের একজোট থাকার জন্য কয়েকটি নিয়ম পালনের কথা বলেছিলেন। সেই নিয়মগুলি দেখে মনে হয় বজ্জিদের রাজ্যে আইনকানুন অনেকটা লেখা থাকত। সেখানে নিরপরাধ মানুষের শাস্তি হতো না।

টুকরো কথা

মগধের রাজাদের সাল-তারিখ

মগধ মহাজনপদে মোট তিনটি রাজবংশ শাসন করেছিল। সেগুলি হলো হর্যঙ্ক, শৈশুনাগ এবং নন্দ রাজবংশ। তবে ঠিক কবে কে মগধের রাজা ছিলেন, তা বলা মুশকিল। একটা আনুমানিক সাল-তারিখ অবশ্য তৈরি করা যায়। গৌতম বুদ্ধের মারা যাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে এই সালগুলো গোনা হয়েছে। মনে করা হয় রাজা অজাতশত্রুর রাজত্বের আট বছরের মাথায় গৌতম বুদ্ধ মারা যান। সেই সালটি ধরা হয় ৪৮৬ খ্রি:পূ:। সেই হিসেবে মগধে হর্যঙ্ক বংশের শাসন শুরু হয়েছিল ৫৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। আর নন্দ বংশের শাসন শেষ হয়েছিল ৩২৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

রাজতান্ত্রিক মহাজনপদগুলির সঙ্গে লড়াইয়ের ফলে গণরাজ্যগুলি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের জন্য দরকার হতো অনেক সৈন্য। সৈন্যদের জন্য খরচ হতো অনেক। সেই খরচের অর্থ জোগাড় করা হতো প্রজাদের ওপর কর বসিয়ে। গণরাজ্যগুলিতে সেই বাড়তি কর আদায় করা সহজ ছিল না। পাশাপাশি সেগুলির মধ্যে গোষ্ঠীবিবাদ পাকিয়ে ওঠে। ফলে গণরাজ্যগুলির পক্ষে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

টুকরো কথা

বজ্জিদের উন্নতির সাতটি নিয়ম

মগধের রাজা অজাতশত্রু একবার বজ্জিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সে বিষয়ে গৌতম বুদ্ধের মতামত জানতে তিনি একজন কর্মচারীকে বুদ্ধের কাছে পাঠান। বুদ্ধ তখন নিজের শিষ্য আনন্দর সঙ্গে সে বিষয়ে কথাবার্তা বলেন। ঐ আলোচনায় বজ্জিদের দেওয়া বুদ্ধের উপদেশের মধ্যে সাতটি নিয়মের কথা ওঠে। বুদ্ধ বলেন, সেই নিয়মগুলি মেনে চললে বজ্জিদের উন্নতি অটুট থাকবে। রাজা অজাতশত্রু কোনোভাবেই বজ্জিদের হারাতে পারবেন না। সেই নিয়মগুলি হলো—

ক) বজ্জিদের প্রায়ই সভা করে রাজ্য চালাতে হবে।
খ) বজ্জিদের সব কাজ সবাই মিলে একজোট হয়ে করতে হবে।
গ) বজ্জিদের নিজেদের বানানো আইন অনুসারে চলতে হবে।
ঘ) বজ্জিসমাজে বয়স্ক মানুষদের কথা শুনে চলতে হবে ও তাদের সম্মান করতে হবে।
ঙ) বজ্জিসমাজে নারীদের সবসময় সম্মান করে চলতে হবে।
চ) বজ্জিদের সমস্ত দেবতার মন্দিরগুলির যত্ন নিতে হবে।
ছ) নিজেদের অঞ্চলে গাছপালা ও পশুপাখিদের উপর অত্যাচার করা যাবে না।

???

ভেবে দেখো

গৌতম বুদ্ধ বজ্জিদের যে সব পরামর্শ দিয়েছিলেন তার মধ্যে কোনগুলো আজও মেনে চলা উচিত? তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

৫.২ নব্যধর্ম আন্দোলন

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি বদলাতে শুরু করে। কৃষি হয়ে ওঠে বেশিরভাগ মানুষের প্রধান জীবিকা। লোহার লাঙলের ব্যবহার বাড়ায় ফসলের উৎপাদন খুব বেড়ে যায়। পাশাপাশি নতুন নতুন নগর এই সময় গড়ে উঠছিল। সেগুলির বাসিন্দাদের একটা বড়ো অংশ ছিল ব্যবসায়ী ও কারিগর। ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই বেশ ধনী ছিল।

যজ্ঞ, পশুবলি ও যুদ্ধের ফলে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের নানা ক্ষতি হতো। চাষের কাজে গবাদিপশুর প্রয়োজন হতো। তাই যজ্ঞে পশুবলি দেওয়া কৃষকদের পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। পাশাপাশি বিভিন্ন জনপদ ও উপজাতিগুলির মধ্যে লড়াই-ঝগড়া ব্যবসার ক্ষতি করেছিল। অথচ নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থাও ব্যবসার জন্য জরুরি ছিল। ধর্মের নামে বেড়েছিল আড়ম্বর ও অনুষ্ঠান। আগে সমাজে কাজের ভিত্তিতে শ্রেণিভাগ ছিল। কিন্তু পরে তা জন্মগত হয়। আর এভাবে প্রবল হয় জাতিভেদ। এই জাতিভেদ প্রথার জন্য সাধারণ মানুষ বৈদিক ধর্মের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তাই সমাজে নতুন ধর্মমতের চাহিদা তৈরি হয়েছিল।

বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রযাত্রা অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হতো। অথচ সমুদ্রযাত্রাকে পাপ হিসাবে দেখত ব্রাহ্মণেরা। ব্যবসা চালাতে গেলে পয়সার লেনদেন ও সুদে টাকা খাটানোর দরকার পড়ত। কিন্তু সুদ নেওয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নিন্দার বিষয় ছিল।

লোহার তৈরি অস্ত্রশস্ত্র ক্ষত্রিয়দের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের সমান ক্ষমতা দাবি করতে থাকে। এইভাবে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শুরু করেছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বদলে নতুন সহজ সরল ধর্মের খোঁজ শুরু হয়েছিল। সেই চাহিদা পূরণ করেছিল বেশ কিছু ধর্ম, যার মধ্যে প্রধান দুটি হলো জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যজ্ঞ ও আচার অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছিল এইসব ধর্মগুলি। সহজ সরল জীবনযাপনের ওপরে তারা জোর দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও বেদের বিরোধিতা করে ধর্ম সম্পর্কে অনেক নতুন কথা বলেছিলেন এইসব ধর্মের প্রচারকরা। নতুন এই ধর্মমতগুলিকেই *নব্যধর্ম* (নতুন ধর্ম) বলা হয়।

জৈন ধর্ম

নতুন তৈরি হওয়া ধর্মমতগুলির মধ্যে জৈন ধর্ম ছিল অন্যতম প্রধান। এই ধর্মের প্রধান প্রচারককে বলা হতো *তীর্থঙ্কর* । জৈন ধর্ম অনুযায়ী মোট চব্বিশজন তীর্থঙ্কর ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শেষ দুজন হলেন পার্শ্বনাথ ও বর্ধমান মহাবীর। পার্শ্বনাথ ছিলেন কাশীর রাজপুত্র। তিনি ছিলেন মহাবীরের প্রায় আড়াইশো বছর আগের মানুষ।

বর্ধমান মহাবীর (খ্রিস্টপূর্ব ৫৪০-৪৬৮) লিচ্ছবি বংশের ক্ষত্রিয় রাজকুমার ছিলেন। বজ্জি জনপদের সঙ্গো লিচ্ছবিদের যোগাযোগ ছিল। তিরিশ বছর বয়সে তিনি সংসার ছেড়ে তপস্যা করতে চলে যান। টানা বারো বছর অনেক কষ্ট মেনেও তপস্যা করতে থাকেন। শেষপর্যন্ত তিনি সর্বজ্ঞানী হন ও কেবলিন নামে পরিচিত

টুকরো কথা

চার্বাক ও আজীবিক

জৈন ও বৌদ্ধদের আগেও ব্রাহ্মণদের ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন চার্বাক ও আজীবিক গোষ্ঠী। এঁরা কেউই বেদকে চূড়ান্ত বলে মানতেন না। চার্বাকরা বর্ণাশ্রম প্রথার বিরোধী ছিলেন। তাঁরা স্বর্গের ধারণা মানতেন না। যজ্ঞে পশুবলির বিরোধী ছিলেন চার্বাকরা। আজীবিক গোষ্ঠী তৈরি করেন মংখলিপুত্ত গোসাল। জানা যায় তিনি ছিলেন মহাবীরের বন্ধু। আজীবিকরা বেদ ও কোনো দেবতায় বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা মানতেন না যে, মানুষ ভালো কাজ করলেই ভালো ফল পাবে। আজীবিকদের কোনো ধর্মগ্রন্থ পাওয়া যায়নি। তাঁরা মৌর্য সম্রাট বিন্দুসার ও অশোকের থেকেও সহায়তা পেয়েছিলেন।

ছবি. ৫.১: বর্ধমান মহাবীর

হন। দীর্ঘ তিরিশ বছর মহাবীর জৈন ধর্ম প্রচার করেন। আনুমানিক বাহাত্তর বছর বয়সে পাবা নগরীতে অনশন করেন মহাবীর। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

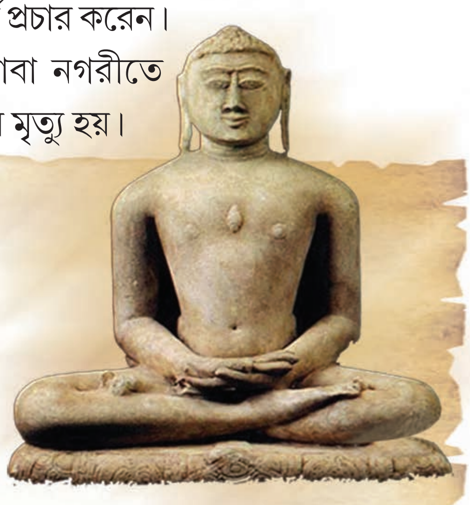

টুকরো কথা

চতুর্যাম ও পঞ্চমহাব্রত

জৈন ধর্মে চারটি মূলনীতি অবশ্যই মেনে চলতে হতো। সেগুলি হলো— ক) কোনো প্রাণী হত্যা না করা। খ) মিথ্যাকথা না বলা। গ) অন্যের জিনিস ছিনিয়ে না নেওয়া। ঘ) নিজের জন্য কোনো সম্পত্তি না করা। পার্শ্বনাথ এই চারটি মূল নীতি মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নীতি চারটিকেই একসঙ্গে *চতুর্যামব্রত* বলা হয়। মহাবীর এই চারটি নীতির সঙ্গে আরো একটি নীতি যোগ করেন। তাঁর মতে, ব্রহ্মচর্য নীতিও জৈনদের মেনে চলা উচিত। এই পাঁচটি নীতিকে একসঙ্গে *পঞ্চমহাব্রত* বলা হয়।

গোড়ার দিকে জৈন ধর্ম মগধ, বিদেহ, কোশল ও অঙ্গারাজ্যের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। মৌর্যযুগে জৈনদের প্রভাব বাড়তে থাকে। জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শেষ জীবনে জৈন হয়ে যান। পরে ওড়িশা থেকে মথুরা পর্যন্ত জৈন ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। জৈন ধর্মের মূল উপদেশগুলি বারোটি ভাগে সাজানো হয়েছিল। এই ভাগগুলিকে *অঙ্গ* বলা হয়। সংখ্যায় বারোটি বলে অঙ্গাগুলিকে একসঙ্গো বলা হয় *দ্বাদশ অঙ্গ*।

টুকরো কথা

দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনের শেষ দিকে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। সেইসময় অনেক জৈন সন্ন্যাসী উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে দাক্ষিণাত্যে চলে যান। ঐ চলে যাওয়া থেকেই জৈনদের মধ্যে দুটি ভাগ হয়ে যায়। দাক্ষিণাত্যে চলে যাওয়া জৈন সন্ন্যাসীদের নেতা ছিলেন ভদ্রবাহু। তিনি বর্ধমান মহাবীরের পথকেই কঠোরভাবে মেনে চলতেন। মহাবীরের মতোই ভদ্রবাহু ও তার অনুগামীরা কোনো পোশাক পরতেন না। এর জন্যেই তাঁদের **দিগম্বর** বলা হয়।

অন্যদিকে উত্তর ভারতে থেকে যাওয়া জৈনদের নেতা ছিলেন স্থূলভদ্র। তিনি পার্শ্বনাথের মতো জৈনদের একটা সাদা কাপড় ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। এই জৈন সন্ন্যাসীদের গোষ্ঠী **শ্বেতাম্বর** বলে পরিচিত হয়। খ্রিস্টীয় প্রথম শতক নাগাদ দিগম্বর ও শ্বেতাম্বরদের বিভেদ পরিষ্কার হয়ে যায়। তবে জৈন ধর্মের মূল নীতিগুলির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিশেষ তফাত ছিল না।

বৌদ্ধ ধর্ম

গৌতম বুদ্ধের প্রথম নাম ছিল সিদ্ধার্থ। নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলাবস্তুর শাক্য বংশে সিদ্ধার্থের জন্ম হয় (খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৬ অব্দ)। সিদ্ধার্থও মহাবীরের মতোই ক্ষত্রিয় বংশের মানুষ ছিলেন। ঊনত্রিশ বছর বয়সে সিদ্ধার্থ সংসার ছেড়ে তপস্যা করতে চলে যান। প্রায় ছ-বছর তপস্যা করার পর সিদ্ধার্থ *বোধি* বা জ্ঞান লাভ করেন। বোধি লাভ করার জন্যই তার নাম হয় *বুদ্ধ*। তাই বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মকে বলা হয় বৌদ্ধ ধর্ম।

টুকরো কথা

গৌতম বুদ্ধের প্রথম উপদেশ

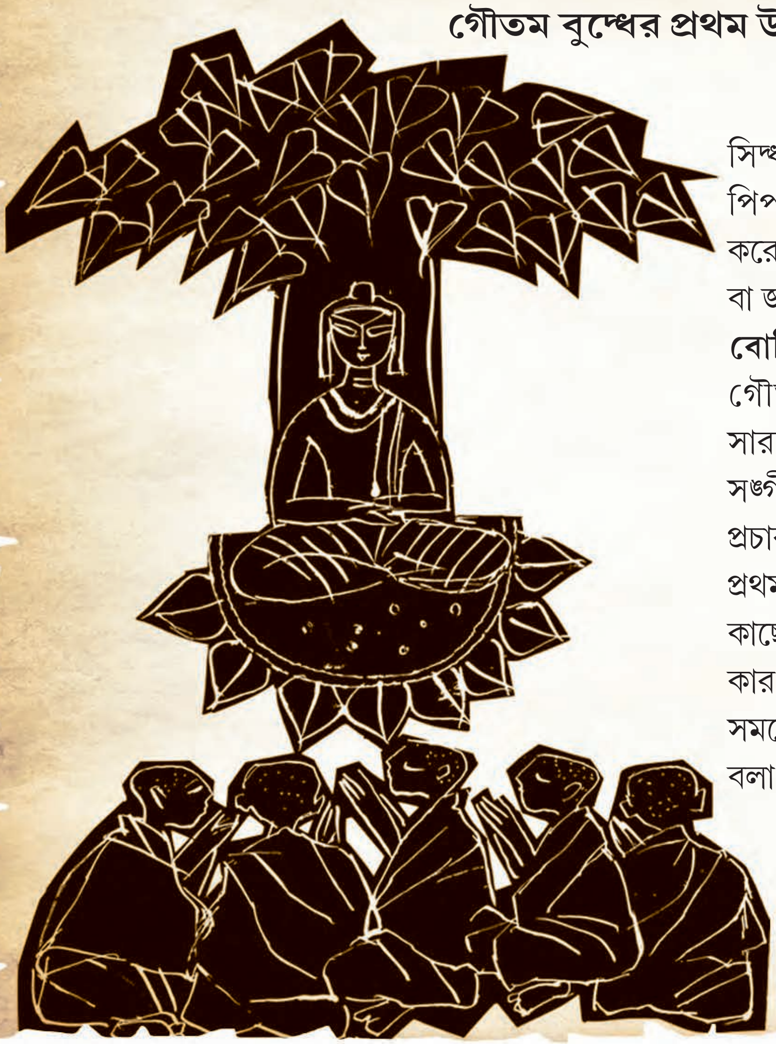

সিদ্ধার্থ গয়ার কাছাকাছি একটি পিপল গাছের নীচে বসে তপস্যা করেছিলেন। সেখানেই তাঁর বোধি বা জ্ঞান লাভ হয় বলে ঐ গাছটিকে **বোধিবৃক্ষ** বলা হয়। গয়া থেকে গৌতম বুদ্ধ বারাণসীর কাছে সারনাথে যান। সেখানে পাঁচজন সঙ্গীর মধ্যে তাঁর উপদেশ প্রথম প্রচার করেন। এই পাঁচজনই তাঁর প্রথম পাঁচ শিষ্য হয়েছিলেন। তাঁদের কাছে তিনি মানুষের জীবনে দুঃখের কারণগুলি ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী সময়ে ঐ ঘটনাকে **ধর্মচক্র প্রবর্তন** বলা হয়েছে।

ছবি. ৫.২:
ধ্যানে বসা গৌতম বুদ্ধের একটি মূর্তি

বুদ্ধ নিজের শিষ্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন দুঃখের কারণ কী? কীভাবে সেই দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? এই প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যায় বুদ্ধ চারটি মূল উপদেশ দেন। প্রতিটি উপদেশকে বলা হয় *আর্যসত্য*। ঐ চারটি উপদেশকে একসঙ্গে *চতুরার্যসত্য* বলা হয়। দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আটটি উপায়ের কথা গৌতম বলেছিলেন। সেই আটটি উপায়কে একসঙ্গে বলা হয় *অষ্টাঙ্গিক মার্গ*। *মার্গ* মানে পথ। আটটি পথকে তাই একসঙ্গে *অষ্টাঙ্গিক মার্গ* বলা হয়।

এরপর বুদ্ধ রাজগৃহে যান। সেখানে মগধের রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের শিষ্য হন। বছরে আট মাস ঘুরে ঘুরে তিনি তাঁর মতামত প্রচার করতেন। কোশল রাজ্যে গৌতম বুদ্ধ টানা ২১ বছর ছিলেন। প্রায় ৪৫ বছর ধর্মপ্রচারের পর কুশিনগরে গৌতম বুদ্ধ মারা যান (আনুমানিক ৪৮৬ খ্রি:পূ:)।

বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে *বৌদ্ধ ধর্মসংগীতি*গুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ধর্মসংগীতি অনেকটা ধর্মসম্মেলনের মতো। সেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সমবেত হতেন। বৌদ্ধ ধর্মের নানা বিষয়ে আলোচনা হতো। সংগীতিগুলিতে নানা বিবাদের প্রসঙ্গও উঠত। এমন চারটি সংগীতির কথা জানা যায়। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পরে পরেই প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি হয়েছিল।

তালিকা ৫.১: একনজরে প্রথম চারটি বৌদ্ধ সংগীতি

সংগীতি	স্থান	শাসনকাল	সভাপতি	গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা
প্রথম	রাজগৃহ	অজাতশত্রু	মহাকাশ্যপ	সুত্ত ও বিনয় পিটক সংকলন করা হয়
দ্বিতীয়	বৈশালী	কালাশোক বা কাকবর্ণ	যশ	বৌদ্ধরা থেরবাদী ও মহাসাংঘিক— এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যান
তৃতীয়	পাটলিপুত্র	অশোক	মোগগলিপুত্ত তিসস	বৌদ্ধ সংঘের নিয়মগুলি কঠোরভাবে মানার উপরে জোর পড়ে। সংঘের মধ্যে ভাঙন আটকাবার চেষ্টা হয়
চতুর্থ	কাশ্মীর	কনিষ্ক	বসুমিত্র	বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান— এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়

ছবি. ৫.৩: গৌতম বুদ্ধের মারা যাওয়ার দৃশ্যের একটি ভাস্কর্য

টুকরো কথা

তিপিটক বা ত্রিপিটক

বৌদ্ধ ধর্মে **তিপিটক** (ত্রিপিটক) প্রধান গ্রন্থ। সুত্তপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধম্মপিটক— এই তিনটি ভাগ নিয়ে তিপিটক। **পিটক** কথার মানে হলো ঝুড়ি। তিনটি সংকলনকে তিনটি ঝুড়ির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সুত্তপিটক হলো গৌতমবুদ্ধ ও তাঁর প্রধান শিষ্যদের উপদেশগুলির সংকলন। বিনয়পিটকে বৌদ্ধসংঘেরও বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের আচার-আচরণের নিয়মগুলি আছে। অভিধম্মপিটক গৌতম বুদ্ধের মূল কয়েকটি উপদেশের আলোচনা। এগুলি সবই পালি ভাষায় লেখা।

গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর রাজগৃহে বৌদ্ধদের প্রথম সভা হয়েছিল। জানা যায় যে, সেখানে ত্রিপিটকের সংকলনগুলি তৈরি হয়। গল্প আছে যে, বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তখন সুভদ্র নামের একজন শিষ্য বলেন, এবারে আমরা নিজেদের ইচ্ছামতো চলতে পারব। সবসময় বুদ্ধের কথা মতো চলতে হবে না। বুদ্ধের আরেক শিষ্য ছিলেন মহাকাশ্যপ। তিনি সুভদ্রের কথা শুনে ভাবলেন, এখনই বৌদ্ধ ধর্মের নিয়মগুলি সংকলন করতে হবে। নয়তো সবাই নিজেদের ইচ্ছামতো চলবে। তাতে বৌদ্ধধর্মের ক্ষতি হবে। সেইমতো মহাকাশ্যপ রাজগৃহে সভা ডাকলেন। সেইসভায় প্রথম দুটি পিটক সংকলন করা হলো।

টুকরো কথা

হীনযান ও মহাযান

জীবনযাপন ও ধর্মীয় আচরণ বিষয়ে বৌদ্ধ সংঘে মতবিরোধ তৈরি হয়। বেশ কিছু সন্ন্যাসী আমিষ খাবার খেতে থাকেন। দামি, ভালো পোশাক পরতে থাকেন। সোনা-রুপো দান হিসাবে নিতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে কিছু সন্ন্যাসী প্রায় পারিবারিক জীবনযাপন শুরু করেন। সংঘের নিয়মনীতি শিথিল হতে থাকে। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মে **মহাযান** নামে এক নতুন দল তৈরি হয়। কুষাণ আমল থেকে বুদ্ধের মূর্তি পুজোর চল শুরু হয়। মহাযানীরা মূর্তি পুজোর সমর্থক ছিলেন। এর ফলে পুরোনো মতের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মহাযান মতামতের বিরোধী হয়ে পড়েন। তাঁরা **হীনযান** নামে পরিচিত হন। সম্রাট কনিষ্ক মহাযান বৌদ্ধমতের সমর্থক ছিলেন। চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতিতেই হীনযান ও মহাযানরা চূড়ান্তভাবে আলাদা হয়ে যায়।

বর্ধমান মহাবীরের সঙ্গো গৌতম বুদ্ধের কয়েকটি মিল ছিল। তাঁরা দুজনেই ক্ষত্রিয় পরিবারের মানুষ ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের বিরোধিতাও করেছিলেন তাঁরা দুজনেই। সমাজের সাধারণ মানুষের জন্য তাঁরা ধর্মপ্রচার করেছিলেন। সবার বোঝার সুবিধের জন্য ব্যবহার করেছিলেন সহজ সরল ভাষা। প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্য উন্নত হয়েছিল জৈন ধর্মের হাত ধরে। বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারের ভাষা ছিল পালি।

তবে মহাবীর কঠোর তপস্যার উপরে জোর দিয়েছিলেন। অন্যদিকে গৌতম বুদ্ধ মনে করতেন কঠোর তপস্যা *নির্বাণ* বা মুক্তি লাভের উপায় নয়। আবার চূড়ান্ত ভোগ-বিলাসেও মুক্তির খোঁজ পাওয়া যায় না। বুদ্ধ তাই *মজ্ঝিম পতিপদা* বা মধ্যপন্থার কথা বলেছিলেন।

মহাবীর ও বুদ্ধ দুজনেই ধর্ম প্রচারের জন্য নগরগুলিতে বেশি যেতেন। নগরে নানারকমের মানুষকে একসঙ্গো পাওয়া যায়। তুলনায় গ্রামে জনগণের বেশিরভাগই ছিল কৃষক। আবার ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নগরে যাওয়া বা থাকা *পাপ* বলে ধরা হতো। তাই জৈন ও বৌদ্ধধর্ম সেইসময়ের নগরগুলোতেই বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল। একথা অবশ্য নব্যধর্ম আন্দোলন বিষয়েই খাটে। মূলত ঐ আন্দোলন ছিল নগরকেন্দ্রিক।

টুকরো কথা

ত্রিরত্ন

জৈন ও বৌদ্ধ— দুই ধর্মেই **ত্রিরত্ন** বলে একটি ধারণা আছে। তিনটি বিষয়কে দুটি ধর্মেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। সেগুলির একেকটিকে **রত্ন** বলে। সংখ্যায় তিনটি তাই তা একসঙ্গো ত্রিরত্ন। তবে জৈন ধর্মের ত্রিরত্ন বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্ন থেকে আলাদা।

সৎ বিশ্বাস, সৎ জ্ঞান ও সৎ আচরণের উপরে জৈনরা জোর দিতেন। এই তিনটিকে একসঙ্গো জৈন ধর্মে ত্রিরত্ন বলা হতো। বৌদ্ধধর্মে গৌতমবুদ্ধ প্রধান ব্যক্তি। তাঁর প্রচার করা ধর্মই বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের দায়িত্ব বৌদ্ধ সংঘের। এই তিন মিলে হয় **বুদ্ধ-ধম্ম-সংঘ**। এই তিনটি বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্ন।

জাতকের গল্প

তিপিটকের মধ্যে *জাতক* নামে কিছু গল্প রয়েছে। মনে করা হয় গৌতম বুদ্ধ আগেও নানান সময়ে জন্মেছিলেন। সেই আগের এক একটি জন্মের কথা জাতকের এক একটি গল্পে বলা হয়েছে। প্রতিটি গল্পের মধ্যে কিছু না কিছু উপদেশ রয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্যই জাতকের গল্পগুলি ব্যবহার করা হতো। পাঁচশোরও বেশি জাতকের গল্প রয়েছে। গল্পগুলি পালি ভাষায় বলা ও লেখা হতো। মানুষের পাশাপাশি পশুপাখিরাও জাতকের গল্পে চরিত্র হিসাবে উঠে এসেছে। জাতকের গল্পগুলি থেকে সেইসময়ের সমাজ বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারা যায়।

সেরিবান ও সেরিবা (সেরিবাণিজ-জাতক)

অনেক দিন আগে সেরিব নামে একটা রাজ্য ছিল। সেখানে থাকত সেরিবান ও সেরিবা নামে দুজন ফেরিওলা। তারা পুরোনো জিনিস কিনত, আর নতুন জিনিস বেচত। সেরিবা সবাইকে ঠকাত। বেশি দামে জিনিস বিক্রি করত। কিন্তু সেরিবান কাউকে ঠকাত না। উচিত দামেই সে জিনিস বিক্রি করত।

একদিন সেরিবা একটা বাড়ির সামনে গিয়ে *খেলনা নেবে* বলে হাঁক দিল। সে বাড়িতে একটা ছোটো মেয়ে তার ঠাকুমার সঙ্গে থাকত। তারা খুবই গরিব। ছোটো মেয়েটা খেলনার জন্য ঠাকুমার কাছে বায়না ধরল। ঠাকুমা তখন একটা ভাঙা থালা নিয়ে খেলনা কিনতে এল। সেরিবাকে বলল, এই থালাটার যা দাম হয় দাও। নাতনির জন্য একটা খেলনা নেব। সেরিবা ভালো করে দেখল থালাটা সোনার। সে ফন্দি করে বলল, থালাটা ভাঙা, কানাকড়িও এটার দাম নয়। এমনি দিলে তাও নিতে পারি। ঠাকুমা বলল, তাহলে থাক। সেরিবা ভাবল একটু ঘুরে আবার একবার এখানে আসতে হবে। এমনিতে না দিলেও, দুটো পয়সা দিলে নিশ্চয়ই থালাটা দিয়ে দেবে। কোনোভাবেই এটা হাতছাড়া করা যাবে না।

খানিক পরেই সেরিবান সেই বাড়িতেই গেল। ছোটো মেয়েটি আবার খেলনার জন্য ঠাকুমার কাছে বায়না ধরল। ঠাকুমা আবার সেই ভাঙা থালাটি সেরিবানকে দেখতে দিল। থালাটা দেখে সেরিবান বলল, এ তো সোনার থালা! অনেক দাম! আমার এই থালা কেনার মতো ক্ষমতা নেই। তখন ঠাকুমা সেরিবানকে বলল, তুমি যা দিতে পারবে তাই দাও। বেশি চাই না। তুমি বলার আগে জানতাম না এটা সোনার থালা। তাই এটা তুমিই নাও। সেরিবান তখন তার সব মুদ্রা ঠাকুমার হাতে দিল। আর তার নাতনিকে দিল কয়েকটা সুন্দর খেলনা। ঠাকুমা ও নাতনি তাতেই খুশি। থালাটি নিয়ে সেরিবান চলে গেল।

এদিকে সেরিবা খানিক পরেই আবার ফিরে এল ঐ বাড়িতে। এসে সব শুনে সে বুঝল থালাটা সেরিবানই নিয়ে গেছে। সেরিবা ছুটল সেরিবানকে ধরবে বলে। যদি থালাটা পাওয়া যায়। কিন্তু সেরিবানকে সে খুঁজেই পেল না। সোনার থালাটা সেরিবার আর পাওয়া হলো না।

↑ ছবি. ৫.৪.
সামেত-শিখর, জৈনদের পবিত্রতম তীর্থক্ষেত্র। মনে করা হয় ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২০ জন এই শিখরেই নির্বাণ লাভ করেছিলেন।

← ছবি. ৫.৫.
বুদ্ধপদ (গৌতম বুদ্ধের পায়ের ছাপ), পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্য, অমরাবতী। পায়ের ছাপের মাঝে ধর্মচক্র রয়েছে।

ভেবে দেখো খুঁজে দেখো

১। **সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :**

১.১) মহাজনপদগুলি গড়ে উঠেছিল ——— (খ্রি: ষষ্ঠ শতকে/খ্রি: পূ: ষষ্ঠ শতকে/খ্রি: ষষ্ঠ সহস্রাব্দে)।

১.২) গৌতম বুদ্ধ জন্মেছিলেন ——— (লিচ্ছবি/ হর্যঙ্ক/শাক্য) বংশে।

১.৩) পার্শ্বনাথ ছিলেন ——— (মগধের রাজা/বজ্জিদের প্রধান/জৈন তীর্থংকর)।

১.৪) আর্যসত্য ——— (বৌদ্ধ/জৈন/আজীবিক) ধর্মের অংশ।

২। **ক-স্তম্ভের সঙ্গে খ-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :**

‘ক’ স্তম্ভ	‘খ’ স্তম্ভ
মগধের রাজধানী	বৌদ্ধ ধর্ম
মহাকাশ্যপ	রাজগৃহ
দ্বাদশ অঙ্গ	প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি
হীনযান-মহাযান	জৈন ধর্ম

৩। **নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :**

৩.১) মগধ ও বৃজি মহাজনপদদুটির মধ্যে কী কী পার্থক্য তোমার চোখে পড়ে?

৩.২) কী কী কারণে মগধ শেষ পর্যন্ত বাকি মহাজনপদগুলির থেকে শক্তিশালী হলো ? সেই কারণগুলির মধ্যে কোনটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে তোমার মনে হয়?

৩.৩) সমাজের কোন কোন অংশের মানুষ নব্যধর্ম আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন? কেন করেছিলেন?

৩.৪) জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মে কী কী মিল ও অমিল তোমার চোখে পড়ে?

৪। **হাতেকলমে করো :**

৪.১) জনপদ থেকে ষোলোটি মহাজনপদ এবং তার থেকে মগধ রাজ্য কীভাবে হলো, তা পিরামিডের আকারে দেখাও।

৪.২) ৬৪ ও ৬৫ নম্বর পৃষ্ঠা জোড়া ছবিটি দেখো। বৌদ্ধ ধর্মে আর্যসত্যের ধারণার সঙ্গে ঐ ছবিটির কি কোনো মিল দেখতে পাচ্ছো?

৬

সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসন

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ

সামিমের কাছে পুরোনো দিনের অনেকগুলো পয়সা আছে। ওর নানা ওকে দিয়েছিলেন। ১ পয়সা, ৫ পয়সা, ১০ পয়সা। কোনোটা চৌকো, কোনোটা ফুলের মতো। স্টিলের চকচকে ছোটো গোল দশ পয়সাগুলো সামিমের খুব প্রিয়। পুরোনো কয়েকটা ২ টাকার নোটও আছে ওর। একদিন সবগুলোই বন্ধুদের আর রুবির দাদুকে দেখাতে নিয়ে গেল। দাদু সব দেখে বললেন, দারুণ তো। তোমরা আর কেউ কিছু জমাও নাকি? পলাশ বলল, আমি খেলনা জমাই। ছোটোবেলার সব খেলনা রয়েছে আমার। রাবেয়া বলল, আমিও খেলনা জমাই। দাদু বললেন, পুরোনো দিনের নানান জিনিস জমিয়ে রাখা ভালো। তাতে একসময়ে বোঝা যাবে সেই জিনিসগুলো কেমন ছিল পুরোনো দিনে। তারপর বললেন, এই যে টাকায় বা পয়সায় সিংহের মুখওলা একটা ছাপ থাকে সেটা কী বলোতো? সবাই বলল, অশোকস্তম্ভ। দাদু বললেন, কেন ঐ স্তম্ভটা টাকা-পয়সায় ছাপা থাকে জানো? রাবেয়া বলল, সম্রাট অশোকের ঐ স্তম্ভটাই ভারতের জাতীয় প্রতীক।

দাদু বললেন, ঐ স্তম্ভটি সারনাথে পাওয়া গেছে। তার মাথায় পিঠোপিঠি চারটি সিংহের মূর্তি আছে। এখন সেটি সারনাথ জাদুঘরে রাখা আছে। একসময়ে সম্রাট অশোক যুদ্ধ করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। মানুষের কাছে শান্তির বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর স্তম্ভটি ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি জাতীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সেটি ওলটানো পদ্মের মতো দেখতে একটি বেদির ওপর রাখা। তার ওপর অশোকচক্র দেখা যায়। এই চক্রের বাঁদিকে ষাঁড় ও ডানদিকে ঘোড়ার মূর্তি।

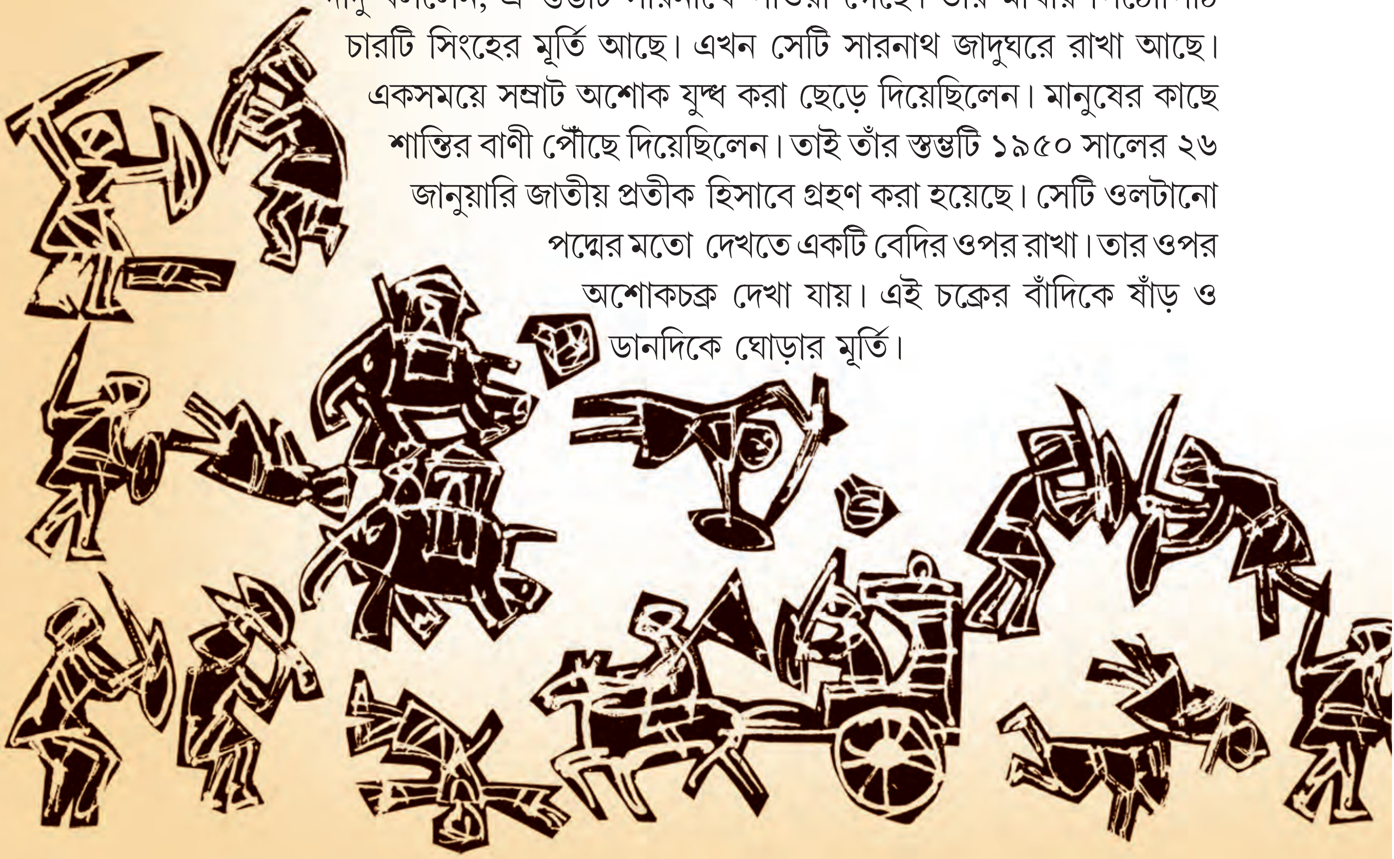

সেদিন বাড়ি ফিরে পৃথার মনে খটকা লাগল। দাদু অশোককে রাজা না বলে সম্রাট বললেন কেন? তাহলে কী রাজা আর সম্রাট আলাদা? পরদিন ক্লাসে দিদিমণিকে সেই প্রশ্নই করল পৃথা। দিদিমণি বললেন, হ্যাঁ, রাজা আর সম্রাট আলাদা। এবারে তাহলে তোমাদের সম্রাট আর সাম্রাজ্যের কথা বলা যাক।

৬.১ সাম্রাজ্য কী ? সম্রাট কে?

সহজ করে বললে, *সাম্রাজ্য* একটা বিরাট অঞ্চলকে বোঝায়। ধরা যাক, একটা রাজ্যে কয়েক হাজার জনগণ থাকে। তাহলে একটা সাম্রাজ্যে কয়েক লক্ষ জনগণ থাকবে। অনেকগুলো রাজ্য জুড়ে একটা বড়ো শাসন এলাকা হয়। সেই বড়ো শাসন এলাকাটাই সাম্রাজ্য।

সাম্রাজ্য শাসন করেন যিনি, তিনিই *সম্রাট*। সম্রাট মানে বড়ো রাজা। যে রাজা অনেক জনগণ ও অঞ্চলের শাসক তিনিই সম্রাট। তাঁর শাসন এলাকায় তাঁর কথাই শেষ কথা। তিনি রাজাদেরও রাজা। অর্থাৎ *রাজাধিরাজ* (রাজা+অধিরাজ)। তবে সম্রাট যদি মহিলা হন, তখন তাকে বলা হয় *সম্রাজ্ঞী*।

সাম্রাজ্য তৈরি হয় যুদ্ধ করে। ধরা যাক, একজন রাজা যুদ্ধ করে অন্য রাজাদের হারিয়ে দিল। তারপর সব রাজ্যগুলো এক করে একটা বড়ো শাসন এলাকা তৈরি হলো। তাকেই সাম্রাজ্য বলা হয়। সেই জয়ী রাজা একটা বড়ো যজ্ঞ করে বিরাট উপাধি নিলেন। তখন তাঁর চেয়ে বেশি শক্তিশালী আর কেউ থাকল না। তিনি হয়ে গেলেন সম্রাট। সবক্ষেত্রে যদিও রাজা যজ্ঞ করে সম্রাট হতেন না।

৬.২ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম সাম্রাজ্য তৈরি হলো কীভাবে?

ষোলটি মহাজনপদের কথা তোমরা আগেই জেনেছ। এই এক একটা মহাজনপদ ছিল এক একটা রাজ্য। মগধ মহাজনপদে পরপর তিনটি রাজবংশ রাজত্ব করেছিল। সেইসব রাজারা অন্যান্য মহাজনপদের বেশিরভাগকে নিজেদের দখলে আনেন। শেষপর্যন্ত মগধকে ঘিরেই ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য তৈরি হয়। তার নাম মৌর্য সাম্রাজ্য।

টুকরো কথা

আলেকজান্ডারের ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযান

খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ নাগাদ হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে পৌঁছেছিলেন গ্রিসের ম্যাসিডনের শাসক আলেকজান্ডার। উপমহাদেশের বিভিন্ন ছোটো-বড়ো শাসকদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। এর মধ্যে এলডার পোরোস বা রাজা পুরুর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ খুব বিখ্যাত। পুরুর রাজত্ব ছিল ঝিলাম ও চেনাব নদী দুটির মাঝের অঞ্চলে। বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে পুরু আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন। কিন্তু গ্রিকবাহিনীর কাছে শেষ পর্যন্ত পুরু হেরে যান। তবু তাঁর বীরত্বকে গ্রিকরা সম্মান জানিয়েছিল।

প্রায় তিন বছর আলেকজান্ডার উপমহাদেশে ছিলেন। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দ-এ তিনি বাহিনী সমেত ফিরে যান। পশ্চিম এশিয়া হয়ে গ্রিসে ফেরার পথে ব্যাবিলনে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে পাঞ্জাব পর্যন্ত আলেকজান্ডার এগিয়েছিলেন। গঙ্গা উপত্যকার দিকে তিনি এগোননি। তবে আলেকজান্ডারের অভিযানের ফলে উপমহাদেশের উত্তরে ছোটো ছোটো শক্তিগুলির ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। তার ফলে খ্রিস্টপূর্ব ৩২০ অব্দ নাগাদ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পক্ষে সাম্রাজ্য গড়ে তোলা সহজ হয়। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অনেক সহজেই মৌর্যদের ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়েছিল।

ছবি. ৬.১: আলেকজান্ডার ও তাঁর প্রিয় ঘোড়া বুকেফেলাস

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কথা

উপমহাদেশে আলেকজান্ডারের অভিযানের সময় মগধের সিংহাসনে ছিলেন নন্দ রাজারা। এঁরা যদিও প্রজাদের প্রিয় ছিলেন না। চাণক্য নামের এক পণ্ডিত নন্দরাজাদের রোষের মুখে পড়েন। চাণক্যের সাহায্যেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দরাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন। শেষ নন্দরাজা ধননন্দ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাছে হেরে যান। এইভাবে মগধে মৌর্যদের শাসন শুরু হয়। নন্দদের সময়ে উত্তর ভারতে মগধের ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেই ক্ষমতাকে আরও অনেক বাড়িয়ে তোলেন। আলেকজান্ডারের সহকারী গ্রিক প্রশাসকদের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যুদ্ধ করেন। সিন্ধু উপত্যকার দখল নিয়ে গ্রিকদের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সংঘাত বাধে। ঐ অঞ্চলের শাসক ছিলেন আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি

সেলিউকাস নিকেটর। তাঁর সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিবাদ একটি চুক্তির মাধ্যমে মিটে যায়। দুই পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়। দুজনেই একে অন্যকে নানান উপহার ও সুযোগ-সুবিধা দেন। ভারতীয় উপমহাদেশে মৌর্য সাম্রাজ্যই প্রথম সাম্রাজ্য। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেই সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫/৩২৪-৩০০ অব্দ)। পাটলিপুত্র ছিল তাঁর রাজধানী। মৌর্য সাম্রাজ্য গড়ে তোলার প্রধান কৃতিত্ব চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যেরই।

টুকরো কথা

অর্থশাস্ত্র

প্রাচীন ভারতের শাসন পরিচালনার বিষয়ে বেশ কিছু বই লেখা হয়। রাজ্যশাসন কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা থাকত ঐ বইগুলিতে। তেমনই একটি বই **কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র**। এর লেখক **কৌটিল্য**। অনেকে কৌটিল্য ও চাণক্যকে একই ব্যক্তি মনে করেন। কিন্তু একথা এখন প্রমাণিত যে, কৌটিল্য ও চাণক্য আলাদা ব্যক্তি।

ঠিক কবে অর্থশাস্ত্র লেখা হয়, তা বলা মুশকিল। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক নাগাদ এই বইয়ের কিছু অংশ লেখা হয়েছিল। তবে খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক নাগাদ অর্থশাস্ত্র লেখার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল। সেই চেহারায় আজকে বইটি দেখা যায়। তাই একা কৌটিল্য এই বইটি বোধহয় লেখেননি। তবে এর মূল বিষয়গুলো তাঁর লেখা বলেই তাঁর নামে বইটি পরিচিত। বইয়ের নামটি থেকে মনে হতে পারে যে, বইটি বোধহয় শুধু টাকাকড়ি নিয়ে লেখা। আসলে কিন্তু তা নয়। অর্থশাস্ত্রের মতে, রাষ্ট্রীয় শাসনকাজে প্রধান হলেন রাজা। তাঁর কথাই শেষ কথা। এমনকি দরকারে রাজাকে ছল-চাতুরিও করতে হতে পারে। রাজকাজের সমস্ত বিষয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা রয়েছে অর্থশাস্ত্রে। বইটিতে শাসকের কী কী করা উচিত তাই বলা হয়েছে। যদিও তার সব উপদেশই যে মৌর্য শাসকেরা মানতেন তেমন প্রমাণ নেই। মৌর্য আমলের ইতিহাস জানার জরুরি উপাদান অর্থশাস্ত্র।

???

ভেবে দেখো

অর্থশাস্ত্র বইটি একজন ব্যক্তির লেখা নয়। তেমনি তোমাদের জানা আর কোন কোন বইয়ের লেখক একজন নন? এইরকমভাবে অনেকে মিলে একটা বই লেখা হতো কেন বলে তোমার মনে হয়? প্রয়োজনে পৃষ্ঠা ১১৪-র টুকরো কথাটিও আলোচনার মধ্যে আনো।

মৌর্য সম্রাট অশোক

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর পরে তাঁর ছেলে বিন্দুসার সম্রাট হন (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ থেকে ২৭৩ অব্দ)। বিন্দুসারের আমলে মৌর্য সাম্রাজ্য বিশেষ বাড়েনি। বিন্দুসারের ছেলে অশোক প্রায় চার দশক শাসন করেন (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ থেকে ২৩২ অব্দ)। গোড়ার দিকে নাকি অশোক খুব নিষ্ঠুর ছিলেন বলে জানা যায়।

সারা জীবনে মাত্র একটি যুদ্ধ করেন তিনি, কলিঙ্গ যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে অনেক মানুষ মারা যায়। সেই হিংসার জন্য পরে অশোক দুঃখ পান। জানা যায় যে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্ত অশোককে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা দেন। এই ঘটনা কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে পরেই ঘটেছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে হিংসা বন্ধ করেন অশোক। যুদ্ধ করাও ছেড়ে দেন তিনি। পশুদের মারাও বন্ধ করে দেন। সব মানুষ যাতে ভালোভাবে থাকতে পারে সেই ব্যবস্থা করেন। তবে তার পাশাপাশি সাম্রাজ্যটাও ধরে রাখেন সম্রাট অশোক। তাঁর সাম্রাজ্য উত্তরে আফগানিস্তান থেকে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। পশ্চিমে কাথিয়াওয়াড় থেকে পূর্বে কলিঙ্গও এই সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল। অশোকের আমলেও মৌর্যদের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র।

ছবি. ৬.২: সম্রাট অশোকের একটি ভাস্কর্য মূর্তি

সাম্রাজ্য চালানোর নানা দিক

কলিঙ্গ রাজ্য জয় করার ফলে মৌর্য সাম্রাজ্যের এলাকা আরো বাড়ল। এতবড়ো সাম্রাজ্য এর আগে দেখা যায়নি। তবে শুধু সাম্রাজ্য বাড়লেই সম্রাটদের কাজ শেষ হয় না। ভালোভাবে শাসন কাজ চালানোর বিষয়টাও জরুরি। মৌর্য সম্রাটরা শাসন চালানোর বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। সাম্রাজ্যের সমস্ত বিষয়ে সম্রাটের হাতেই ছিল চূড়ান্ত ক্ষমতা। বিচারব্যবস্থারও মাথায় ছিলেন সম্রাট নিজে। সম্রাটের জারি করা আদেশ প্রজারা মানতে বাধ্য থাকত। তবে মৌর্য প্রশাসনে পুরোহিতদের বিশেষ ভূমিকা দেখা যায় না। মৌর্য সম্রাটরা কোনো যজ্ঞ করে নিজেদের ক্ষমতা দাবি করেননি। তাঁরা *দেবানংপিয়* বা দেবতাদের প্রিয় উপাধি ব্যবহার করতেন। অশোক তার সঙ্গে *পিয়দসি* বা প্রিয়দর্শী উপাধিও যোগ করেছিলেন। ফলে মৌর্য সম্রাটরা প্রজার কাছে দেবতার মতোই সম্মাননীয় ব্যক্তি হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতেন।

ছবি. ৬.৩: মৌর্য আমলের মুদ্রা। মুদ্রার আকারটি খেয়াল করো

বিরাট মৌর্য সাম্রাজ্যের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল মগধ। অশোক নিজেকে *মগধরাজ* (*রাজা মাগধে*) বলে ঘোষণা করেছেন। উত্তর ভারতের অনেকগুলি রাজ্য মৌর্যরা জয় করেছিল। সেগুলো ছিল প্রধান প্রধান শাসন এলাকা। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও দাক্ষিণাত্যের এলাকাগুলো ছিল *প্রান্তীয় অঞ্চল*। তবে মগধ ও প্রধান শাসন এলাকাগুলোতেই মৌর্য শাসনের দাপট সবথেকে বেশি ছিল।

সম্রাটের পরেই ছিলেন রাজকর্মচারীরা। তাদের বলা হতো *অমাত্য*। অমাত্যদের সাহায্যেই সম্রাট শাসন চালাতেন। মৌর্যদের সময়ে মন্ত্রী পরিষদ ছিল। তবে তাদের পরামর্শ মানতে সম্রাট বাধ্য ছিলেন না। অমাত্যদের মধ্যে তিনরকম পদের ভাগ ছিল। তাদের বেতনে পার্থক্য ছিল। সম্রাট অশোকের

সময়ে অবশ্য অমাত্যদের কথা জানা যায় না। তার বদলে *মহামাত্র*রা সবথেকে উঁচু পদগুলি পেতেন। সম্রাট অশোকের শাসন ব্যবস্থা অনেকটাই মহামাত্রদের ওপর নির্ভর করত। মহামাত্রদের মধ্যেও পদের নানা ভাগ ছিল। তাদের কাজের এলাকা আলাদা ছিল। মেয়েদেরও মহামাত্র হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হতো।

টুকরো কথা

পাটলিপুত্র নগর পরিচালনা : মেগাস্থিনিসের চোখে

গ্রিক শাসক সেলিউকাসের দূত হয়ে মেগাস্থিনিস কান্দাহার থেকে পাটলিপুত্রের রাজদরবারে যান। নিজের বই **ইন্ডিকা**তে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনের কথা লিখেছিলেন মেগাস্থিনিস। যদিও ঐ বইটি এখন পাওয়া যায় না। তবে অন্যান্য গ্রিক লেখকদের লেখায় বইটির নানা অংশ রয়েছে। গ্রিক হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশের ভাষা ও সমাজ পুরোপুরি বুঝতে পারেননি মেগাস্থিনিস। ফলে তাঁর লেখায় অনেক ভুল আছে। তবু মৌর্য আমলের ইতিহাস জানার জন্য **ইন্ডিকা** জরুরি বিদেশি উপাদান।

মেগাস্থিনিসের লেখা থেকে পাটলিপুত্র নগরের শাসন পরিচালনার কথা জানা যায়। নগর পরিচালকদের ছয়টি দল ছিল। প্রতিটি দলে ছিল পাঁচজন করে লোক। ছ-টি দল মিলেই নগরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দেখাশোনা করত। তারা মন্দির, বন্দর, বাজারগুলির যত্ন নিত। আর ঠিক করত জিনিসপত্রের দাম। নগর পরিচালনার কাজে সাহায্যের জন্য থাকত সেনাবাহিনী।

সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে মৌর্যদের সেনাবাহিনীর দরকার ছিল। সেনাবাহিনীর ওপর সম্রাটের ক্ষমতা ছিল চূড়ান্ত। জানা যায় যে, মৌর্যদের সেনাবাহিনী ছিল বিরাট। ঘোড়া, রথ, হাতি, নৌকা প্রভৃতির ব্যবহার ছিল সেনাবাহিনীতে। সঙ্গে ছিল পদাতিক সেনা, যারা পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করত। মৌর্য সম্রাটরাই প্রথম গুপ্তচরদের সাম্রাজ্যের খোঁজখবর আনতে কাজে লাগান। বিদেশি বা অচেনা সন্দেহজনক লোক সবার ওপরেই গুপ্তচরের নজর থাকত। রাজকর্মচারী এমনকি রাজপুত্ররাও চরদের নজরের বাইরে যেতে পারত না। সাম্রাজ্যের সব খবর চলে যেত সম্রাটের কাছে।

টুকরো কথা

মহাস্থানগড়

মহাস্থান বা মহাস্থান-গড় হলো বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার একটি প্রত্নস্থল। এখানে পাওয়া গেছে মৌর্য যুগের ব্রাহ্মী-লিপিতে লেখা একটি লেখ। মৌর্য সম্রাট অশোকের লিপির সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। যার সময়কাল খ্রি:পূ: তৃতীয় শতক। মহাস্থান লেখটি লেখা হয়েছিল প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের (বর্তমান মহাস্থান) মহামাত্র -র উদ্দেশ্যে। এই লেখটি আসলে ছিল মৌর্য রাজার আদেশ। যে আদেশে কীভাবে মৌর্য রাজারা দুর্ভিক্ষের (প্রাকৃতিক বা অন্যান্য কারণে যে জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হয়) মোকাবিলা করবেন তার পরামর্শ দেওয়া আছে। এই 'দুর্ভিক্ষ' ছিল তিন প্রকার। পঙ্গপাল ফসল নষ্ট করার দুর্ভিক্ষ, দাবানলের দুর্ভিক্ষ এবং বন্যার ফলে দুর্ভিক্ষ।

টুকরো কথা

রাজা হওয়া কী সহজ কথা !

কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে বলেছেন কুঁড়ে রাজার প্রজারাও কুঁড়ে হয়। রাজা যদি কাজ করেন তাহলে প্রজারাও কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাই একজন রাজার রোজ কী কী করা উচিত, তার তালিকা দিয়েছেন কৌটিল্য। ২৪ ঘণ্টাকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি ১২ ঘণ্টায় আটরকম কাজ রাজা করবেন। সূর্য ওঠার ঠিক পর থেকে রাত পর্যন্ত সেইসব কাজ চলবে। তালিকাটা খানিকটা এইরকম দাঁড়ায় :

দিন	রাত
১) জমা খরচের হিসাব পরীক্ষা করবেন। দেশের সুরক্ষার খোঁজ খবর নেবেন।	১) গুপ্তচরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন।
২) নগর ও গ্রামের জনগণের সুবিধা-অসুবিধার কথা শুনবেন।	২) স্নান-খাওয়া ও পড়াশোনা করবেন।
৩) স্নান-খাওয়া ও পড়াশোনা করবেন।	৩) বাজনা শুনতে শুনতে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নেবেন।
৪) নগদ রাজস্ব নেবেন। বিভিন্ন মন্ত্রীদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেবেন।	৪) ও ৫) ঘুমাবেন ।(সবমিলিয়ে ৪½ ঘণ্টা ঘুম বরাদ্দ রাজার জন্য)
৫) মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ নেবেন, চিঠিপত্র লিখবেন। গুপ্তচরদের আনা গোপন খবর শুনবেন।	৬) বাজনার শব্দ শুনে ঘুম থেকে উঠবেন। শাসনের নানা পদ্ধতি নিয়ে ভাববেন। কী কী কাজ করতে হবে তা নিয়েও চিন্তা করবেন।
৬) বিশ্রাম নেবেন বা নিজের খুশিমতো কাজ করবেন। না হলে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন।	৭) মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। গুপ্তচরদের বিভিন্ন কাজে পাঠাবেন।
৭) হাতি, ঘোড়া, রথ, সৈন্য-সামন্তদের অবস্থা খুঁটিয়ে দেখবেন।	৮) পুরোহিতের আশীর্বাদ নেবেন। নিজের চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করবেন। প্রধান রাঁধুনি ও জ্যোতিষীর সঙ্গে দেখা করবেন।
৮) সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ ও সেনাবাহিনী নিয়ে আলোচনা করবেন।	

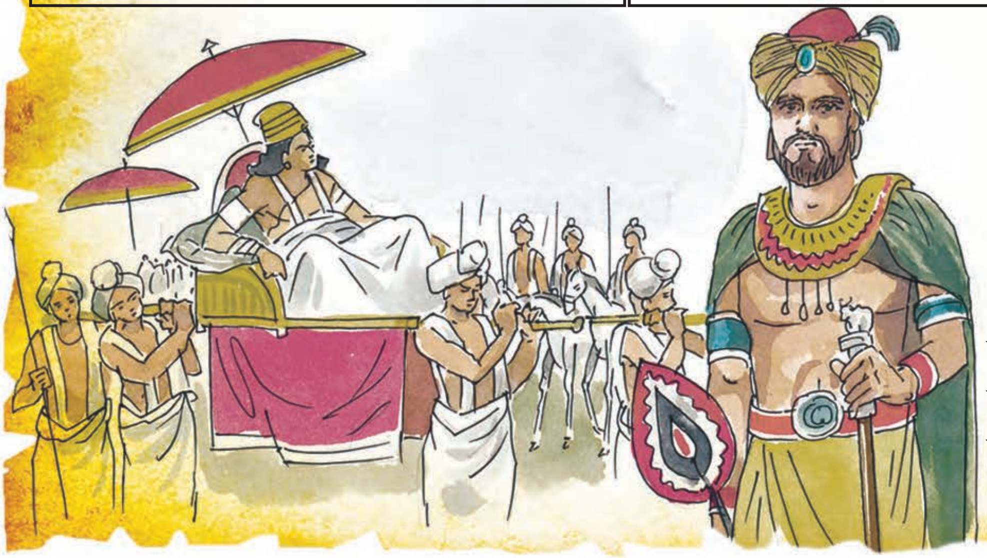

ভেবে দেখো

তোমরা সারাদিনে কী কী কাজ করো? সেইসব কাজের একটা তালিকা বানাও।

বিরাট সাম্রাজ্যের শাসন চালানোর জন্য সম্রাটরা কর নিতেন প্রজাদের থেকে। মৌর্যরাই প্রথম রাজস্ব বা কর ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজায়। রাজস্বের বেশি ভাগটাই আসত কৃষি থেকে। চাষি তার ফসলের $\frac{1}{6}$ ভাগ দিত রাজস্ব হিসাবে। *বলি* ও *ভাগ* নামের দু-রকম ভূমি-রাজস্ব মৌর্য আমলেও চালু ছিল। তবে সম্রাট চাইলে কর ছাড় দিতে পারতেন। গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী গ্রামের *বলি* কর ছাড় দিয়েছিলেন সম্রাট অশোক। কারিগর, ব্যবসায়ী, বণিক সবার থেকে কর আদায় করত মৌর্য প্রশাসন। তবে পাটলিপুত্রে বসে বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করা সম্ভব ছিল না। সেই সাম্রাজ্যের নানা প্রদেশেও শাসনকাজের দেখভাল করার বিষয়ে সম্রাটদের ভাবতে হতো। প্রদেশের নীচে ছিল জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনকে *আহার* বলা হতো। এইভাবে সম্রাট ও তার নীচে রাজকর্মচারীদের নানা স্তরভাগ দেখা যায় মৌর্য শাসনব্যবস্থায়। সাম্রাজ্যের নানা অঞ্চলে জনগণের ভাষা ছিল আলাদা। সেই কথা মাথায় রেখেই সম্রাটের বক্তব্য বিভিন্ন ভাষায় প্রচার করা হতো। সাম্রাজ্যের উত্তর অংশে ব্যবহার হতো পালি ভাষা। অন্যদিকে দক্ষিণ অংশে বক্তব্য প্রচারের ভাষা ছিল প্রাকৃত।

শুধু কর্মচারী, সেনা, গুপ্তচরদের উপরেই মৌর্য সাম্রাজ্যের ভিত দাঁড়িয়ে ছিল না। মৌর্য সম্রাট অশোক তাঁর ধম্মনীতি বা ধর্মনীতি দিয়ে জনগণকে একজোট করতে চেষ্টা করেন। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর আর যুদ্ধ করেননি অশোক। হিংসার বদলে শান্তির নীতি নেন তিনি। বৌদ্ধ রীতিনীতি তাঁর ওপরে ছাপ ফেলেছিল। মানুষ ও পশুপাখিদের ওপর হিংসা বন্ধের জন্য চেষ্টা করেন অশোক। সাম্রাজ্যের সব জায়গায় ধম্মের কথা পৌঁছে দেন তিনি।

টুকরো কথা
অশোকের ধম্ম

অশোকের ধম্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথায় বেশ কিছু মিল দেখা যায়। তবু ধম্ম বৌদ্ধ ধর্ম নয়। কারণ, অষ্টাঙ্গিক মার্গের মতো বিষয় অশোকের ধম্মে নেই। এমনকি তাতে নেই নির্বাণ লাভের কথাও। আসলে ধম্ম কতগুলো সামাজিক আচরণের ওপরেই বেশি জোর দেয়। হিংসা না করা এর মূল কথা। প্রাণীহত্যা বন্ধ করার ওপরেও জোর দিয়েছিলেন অশোক। এমনকি শিকার ও মাছ ধরার উপরেও তিনি নিষেধ জারি করেন। অশোক ঘোষণা করেন, এক প্রাণী অন্য প্রাণীর খাবার হতে পারে না। এর পাশাপাশি, দয়া, দান, সত্যকথন এইসব আচরণের কথা ধম্মে বলা হয়েছে। বাবা-মা, গুরুজনদের মেনে চলার কথাও ধম্মে বলা হয়েছে। এই উপদেশগুলো বিশেষ কারো জন্যই নয়। সব মানুষের জন্যই অশোক তাঁর ধম্মের কথা বলেন। অশোক প্রজাদের নিজের সন্তান বলেছিলেন। তাই মনে করা হতো প্রজারা পিতার মতো সম্রাটকে মানবে। সম্রাটকে মেনে চলাই ছিল মৌর্য শাসনের মূল ভিত।

টুকরো কথা
মৌর্য্য শাসন ও জঙ্গলের বাসিন্দা

মৌর্য শাসকরা বিভিন্ন ধরনের লোকেদের একটি শাসনের আওতায় আনতে চেয়েছিল। কিন্তু জঙ্গলের বাসিন্দাদের প্রতি তাদের মনোভাব ভালো ছিল না। বনে যারা থাকে তাদের **নীচ, অসভ্য** ও **বুনো** বলে ধরা হতো। অটবি মানে বন। বনে যারা থাকে তারা **আটবিক**। তারা নাকি মৌর্য সাম্রাজ্যে নানান গোলমাল পাকাত। আরেক দল বনবাসী ছিল **অরণ্যচর**। তারা ছিল ভালো ও শান্ত। তবে বনবাসীদের জনপদের অংশ ধরা হত না। গুপ্ত-চরেরা ঋষির ছদ্মবেশে বনবাসীদের উপর নজর রাখত। বন থেকে অনেক কিছু পাওয়া যেত। তাই বনের উপর সম্রাটের দখল কায়েম করার দরকার ছিল। গাছ কাটলে বা পশুপাখিদের মারলে বনবাসীদের শাস্তির কথাও বলেছিলেন সম্রাট অশোক।

মানচিত্র ৬.১ : অশোকের সময় মৌর্য সাম্রাজ্য (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক)

৬.৩ মৌর্য শাসনের শেষ দিক, কুষাণ ও সাতবাহন শাসন

সম্রাট অশোক মারা যাওয়ার পর মৌর্য সাম্রাজ্যে নানান রকম সমস্যা দেখা দেয়। যোগ্য সম্রাটের অভাবে ছোটো রাজারা স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে। এই সময় নানান বিদেশি জাতি ভারতে আসতে থাকে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১৮৭ অব্দ নাগাদ শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে সরিয়ে রাজা হলেন পুষ্যমিত্র সুঙ্গ।

মনে রেখো

মৌর্যদের পর মগধে শুরু হলো সুঙ্গদের শাসন। পুষ্যমিত্র এবং অগ্নিমিত্র ছিলেন সুঙ্গদের দুজন প্রধান শাসক। সুঙ্গদের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে মগধের শাসক হন কাণ্বরা। চারজন কাণ্ব শাসকের কথা জানা যায়। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষভাগে কাণ্বদের শাসনও শেষ হয়ে গিয়েছিল।

এই সময় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজনৈতিক অবস্থা বদলে যায়। ব্যাক্ট্রিয়ার গ্রিকরা ও শক-পহ্লবরা অনেক অঞ্চলে শাসন শুরু করে। যদিও কুষাণরাই শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল।

টুকরো কথা

গঙ্গারিদাই

গ্রিক ও রোমান সাহিত্যে মগধের পূর্বদিকে এক শক্তিশালী রাজ্যের কথা পাওয়া গেছে। তার নাম **গঙ্গারিদাই** বা **গঙ্গারিদ** (গঙ্গাহৃদ)। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল **গঙ্গা** বা **গ্যাঙ্গে** বন্দর-নগর। তলেমির মতে, গঙ্গানদীর পাঁচটি মুখ বা মোহনার সবটাই জুড়ে ছিল গঙ্গারিদাই । নন্দরাজাদের আমলে এই রাজ্যের সঙ্গে মগধের যোগাযোগের কথা গ্রিক লেখকরা লিখেছেন। আলেকজান্ডারের আক্রমণের সময় নাকি গঙ্গারিদাইয়ের সেনাবাহিনী মগধের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই রাজ্যের হস্তীবাহিনী ও যোদ্ধাদের বীরত্বের কথা গ্রিক ও রোমান লেখকরা লিখেছেন। মনে হয় যে, গঙ্গারিদাই রাজ্যটিকেই পেরিপ্লাসের লেখক **গঙ্গাদেশ** বলে উল্লেখ করেছেন। এই রাজ্যের নামের মধ্যেই গঙ্গানদীকে ঘিরে তার অবস্থান বোঝা যায়। চিনা সাহিত্য ও কালিদাসের লেখার তুলনা করলে আরো একটি বিষয় উঠে আসে। তা হলো,গঙ্গাদেশ বা গঙ্গারিদাই ও বঙ্গের অবস্থান একই জায়গায়। মগধ ও গঙ্গারিদাই দুটি রাজ্যই **তামালিতেস** বা তাম্রলিপ্ত ও গ্যাঙ্গে বন্দর দুটি ব্যবহার করত। গ্রিক লেখক দিওদোরাস-এর মতে, ভারতবর্ষে বহুজাতির বাস। কিন্তু গঙ্গারিদাই জাতি সবার সেরা।প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাম্রলিপ্ত বা তমলুক, চন্দ্রকেতুগড়, দেগঙ্গা প্রভৃতি স্থানে অনেক প্রত্ন-উপাদান পেয়েছেন। সেইসব উপাদানের সঙ্গে গঙ্গারিদাই-এর সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়।

কুষাণ কারা?

মধ্য এশিয়া থেকে কয়েকটি যাযাবর গোষ্ঠী পশ্চিম দিকে চলে যায়। এরা এখনকার আফগানিস্তান ও ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে পৌঁছোয়। এদের মধ্যে ইউয়ে-ঝি গোষ্ঠীটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঐ গোষ্ঠীর একটি শাখা ছিল কু এই য়ুয়াং। তারা ব্যাকট্রিয়ার ওপর অধিকার কায়েম করেছিল। এরাই ভারতের ইতিহাসে কুষাণ নামে পরিচিত। ধীরে ধীরে কুষাণরা এক বিরাট সাম্রাজ্য তৈরি করেছিলেন।

ছবি. ৬.৪:
কুজুল কদফিসেসের তামার মুদ্রা

ছবি. ৬.৫:
বিম কদফিসেসের সোনার মুদ্রা

ছবি. ৬.৬:
কনিষ্কের সোনার মুদ্রা

ছবি. ৬.৭:
হুবিষ্কের সোনার মুদ্রা

কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান কৃতিত্ব ছিল কুজুল কদফিসেস-এর। কাবুল ও কাশ্মীর এলাকা তাঁর দখলে ছিল। তারপর শাসক হন কুজুলের ছেলে বিম কদফিসেস। সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে বিমের শাসন ছিল। বিরাট শক্তিশালী কুষাণ শাসক হিসাবে জমকালো উপাধি নিয়েছিলেন বিম। ভারতীয় উপমহাদেশে সোনার মুদ্রা তিনিই প্রথম চালু করেন।

বিমের ছেলে প্রথম কনিষ্ক কুষাণদের সেরা রাজা। অন্তত তেইশ বছর রাজত্ব করেন কনিষ্ক। ৭৮ খ্রিস্টাব্দে শাসক হন তিনি। সেই বছর থেকে *শকাব্দ* গণনা শুরু হয়। কনিষ্কের আমলে কুষাণ শাসন গঙ্গা উপত্যকার বিরাট অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখনকার পাকিস্তানের প্রায় পুরো অঞ্চলটাই কুষাণ শাসনের আওতায় ছিল। মথুরা পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে কুষাণ শাসন ছড়িয়ে পড়ে। কনিষ্কর রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশাওয়ার। তবে, কুষাণদের প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল ব্যাকট্রিয়া বা বাহ্লিক দেশ।

প্রথম কনিষ্কের পরে বাসিষ্ক ও হুবিষ্ক শাসক হন। আস্তে আস্তে কুষাণ শাসনের অবনতি দেখা দেয়। একসময় ব্যাকট্রিয়াও কুষাণদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ২৩০ খ্রিস্টাব্দের পরে কুষাণ শাসকদের কথা বিশেষ জানা যায় না।

টুকরো কথা

কলিঙ্গরাজ খারবেল: হাতিগুম্ফা শিলালেখ

মৌর্য সম্রাট অশোকের আমলে কলিঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। মৌর্যদের পরে কলিঙ্গ আবার স্বাধীন হয়ে যায়। চেদি বংশের শাসকরা কলিঙ্গে শাসন শুরু করেন। ঐ বংশের শাসক খারবেল কলিঙ্গের প্রথম শক্তিশালী রাজা। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষ ভাগে খারবেলের শাসন ছিল। হাতিগুম্ফা শিলালেখ থেকে খারবেলের বিষয়ে জানা যায়। ঐ শিলালেখতে **ভারতবর্ষ** শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে সেখানে ভারতবর্ষ বলতে সম্ভবত গঙ্গা উপত্যকার একটা অংশ বোঝানো হয়েছিল। তবে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের প্রথম দিকেই চেদিদের শাসন শেষ হয়ে গিয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতের সাতবাহন শাসন

মৌর্য সাম্রাজ্যের পরে দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন শাসন দেখা গিয়েছিল। ঐ সময় দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিম অংশে ও গুজরাট এলাকায় ছিল শকদের শাসন। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের দ্বিতীয় ভাগে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহনদের শাসন শুরু হয়েছিল। আনুমানিক ২২৫ খ্রিস্টাব্দ বা তার কিছু পরে সাতবাহন শেষ হয়ে যায়।

সাতবাহন বংশের প্রথম শাসক সিমুক-এর সময় প্রতিষ্ঠান ও নানাঘাট অঞ্চলে সাতবাহন শাসন ছিল। রাজা প্রথম সাতকর্ণি ছিলেন সাতবাহন বংশের তৃতীয় রাজা। তাঁর আমলে সাতবাহনদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। প্রায় সারা দক্ষিণ ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর ক্ষমতা। তবে সাতবাহনদের প্রধান বিপক্ষ ছিল পশ্চিম ভারতের শক-ক্ষত্রপ শক্তি। এই সময় দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে শক-সাতবাহন লড়াই জরুরি হয়ে উঠেছিল। প্রথম দিকে এই লড়াইয়ে শক শাসক নহপান সফল হয়েছিলেন।

সাতবাহনদের ক্ষমতা ফিরে এসেছিল গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির আমলে। পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত সমস্ত দাক্ষিণাত্যে তাঁর শাসন ছিল। শক-ক্ষত্রপদের হারিয়ে গুজরাটের দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে এবং মালবেও গৌতমীপুত্রের অধিকার কায়েম হয়। তাঁর আমলের *নাসিক লেখ* ও *কার্লে লেখ* থেকে তাঁর রাজ্যবিস্তারের কথা জানা যায়।

অন্য একটি শক-ক্ষত্রপ গোষ্ঠীর সঙ্গেও সাতবাহনদের লড়াই বেধেছিল। ঐ গোষ্ঠীর বিখ্যাত শাসক ছিলেন রুদ্রদামন। তিনি *মহাক্ষত্রপ* উপাধি নিয়েছিলেন। তাঁর কৃতিত্ব জানা যায় জুনাগড়ে পাওয়া একটি শিলালেখ থেকে। শক-ক্ষত্রপ শাসকদের ক্ষমতা উজ্জয়িনী থেকে গুজরাট ও কাথিয়াওয়াড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

শক-সাতবাহন লড়াইয়ের পিছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক — দুই দিকই ছিল। বিশেষ কয়েকটি এলাকার ওপর দুটি শক্তিই দখল কায়েম করতে চেয়েছিল। তেমন একটি এলাকা ছিল পূর্ব ও পশ্চিম মালব। পূর্ব মালবে কোসা এলাকায় একটি হিরের খনি ছিল। পশ্চিম মালবের মধ্যে দিয়ে সমুদ্র-বাণিজ্য হতো। তাছাড়া দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূল দিয়ে রোম-ভারত বাণিজ্য চলত। ফলে ঐ এলাকাগুলির দখল নিয়ে শক ও সাতবাহনদের লড়াই চলেছিল।

ধীরে ধীরে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহনদের শাসন শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার জায়গায় বেশ কয়েকটি ছোটো ছোটো রাজবংশ গড়ে উঠেছিল।

কুষাণ এবং সাতবাহন শাসন পদ্ধতি

প্রাচীন চিনের সম্রাটরা নিজেদেরকে *দেবতার পুত্র* বলতেন। কুষাণরা আদতে চিন থেকে এসেছিলেন। হয়তো সেজন্যই চিন সম্রাটদের মতো তাঁরাও নিজেদের *দেবপুত্র* অর্থাৎ দেবতার পুত্র বলে ঘোষণা করতেন। বিম কদফিসেস *দমঅর্ত* বা *বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্তা* উপাধি নিয়েছিলেন। কনিষ্ক উপাধি নিয়েছিলেন *মহারাজা রাজাধিরাজ দেবপুত্র শাহী*। কুষাণদের মুদ্রায় সম্রাটের মাথার পিছনে এক রকমের জ্যোতির্বলয় দেখা যায়। তেমন জ্যোতির্বলয় দেবতাদের মাথার পিছনেও খোদাই

টুকরো কথা

নাসিক লেখ

মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে পাওয়া গেছে দু-টি লেখ। একটি গৌতমী-পুত্র সাতকর্ণির রাজত্বের ১৮ বছরের, অন্যটি ২৪ বছরের। শকদের ধ্বংস করে গৌতমীপুত্র সাতবাহনদের হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরিয়ে এনেছিলেন। মনে হয় যে তিনি নাসিক এলাকার উপর ফের শাসন কায়েম করেছিলেন। মুদ্রা থেকেও এই কথা প্রমাণ হয়। পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত পুরো দাক্ষিণাত্য তিনি অধিকার করেছিলেন। শকক্ষত্রপ নহপানের বিরুদ্ধে সফল হলেও, কার্দমক বংশের শক রাজা চষ্টনের কাছে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি পরাজিত হয়েছিলেন।

মানচিত্র ৬.২ : ভারতীয় উপমহাদেশের কয়েকটি রাজশক্তি (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক)

করা হতো। সম্রাট ও দেবতাদের একই বোঝানোর জন্য শাসকরা নানান উদ্যোগ নিতেন। তেমনই একটি উদ্যোগ ছিল *দেবকুল* প্রতিষ্ঠা। বিশাল কুষাণ সাম্রাজ্যে নানারকমের মানুষ বাস করতো। তাদের সবাইকে একজোট করার জন্যই শাসককে দেবতার মতো প্রচার করা হতো। দেবকুল মন্দিরের মতোই একটা পুজোর জায়গা। সেখানে কুষাণ সম্রাটের মূর্তিও রাখা হতো। মথুরায় একটি দেবকুল ছিল। সেখানে সম্রাট বিমের সিংহাসনে বসা মূর্তি পাওয়া গেছে। সম্ভবত প্রথম কনিষ্কের মাথা ভাঙা মূর্তিটি ঐ দেবকুলেই ছিল।

কুষাণ শাসনে লক্ষ করার মতো বিষয় হলো দুজনে মিলে রাজ্যপাট চালানো। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বাবা ও ছেলে একসঙ্গে শাসন কাজ চালাতেন। শাসন ব্যবস্থার সুবিধের জন্য সাম্রাজ্যকে ভাগ করা হতো কতগুলি প্রদেশে। সেই প্রদেশের শাসককে বলা হতো *ক্ষত্রপ*।

সাতবাহন শাসন ব্যবস্থায়ও প্রধান ছিলেন রাজা। তিনি আবার সেনাবাহিনীরও প্রধান ছিলেন। কুষাণদের মতোই সাতবাহন শাসকরা শাসনের সুবিধের জন্য বড়ো অঞ্চলকে ছোটো প্রদেশে ভাগ

করেছিলেন। সাতবাহন শাসনে প্রদেশের দায়িত্বে থাকত অমাত্য নামের রাজকর্মচারী। ভাগ ও বলি — দু-রকম করই নেওয়া হতো। উৎপন্ন ফসলের $\frac{1}{6}$ অংশ ভাগ হিসাবে নেওয়া হতো। বাণিজ্যিক লেনদেনের থেকে কর আদায় করা হতো। কুষাণ-সাতবাহন আমলে বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়েছিল। ফলে কারিগর ও বণিকদের থেকে শাসকরা কর আদায় করতেন। বণিকদের থেকে নগদ কর নেওয়া হতো সাতবাহন আমলে। সাতবাহন শাসকরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে জমি দিলে তার কর নিতেন না। বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো কোনো কর মকুব করা হতো। মৌর্যদের মতোই কুষাণ ও সাতবাহন শাসকরা নুনের ওপর কর বসিয়েছিলেন।

রাজতান্ত্রিক শাসনের পাশাপাশি অরাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর শাসনও ছিল। মধ্য ভারত ও পশ্চিম ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে অরাজতান্ত্রিক গণসংঘগুলি টিকে ছিল। এরা নিজেদের তামার মুদ্রা চালু করেছিল। রাজশক্তিগুলির সঙ্গে গণসংঘগুলির লড়াই এই পর্যায়েও চলেছিল।

টুকরো কথা
কনিষ্কের মূর্তি

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মথুরার কাছে একটি ক্ষেত থেকে একটি মূর্তি পাওয়া যায়। সেটার মাথা ও বাহু ভাঙা ছিল। দেখে সেটাকে একজন যোদ্ধা রাজার মূর্তি বলেই মনে হয়েছিল। মূর্তির ডান হাতে একটা রাজদণ্ড ধরা রয়েছে। বাঁ-হাতের মুঠোয় কারুকাজ করা তলোয়ারের বাঁট। লম্বা, হাঁটু পর্যন্ত কোট রয়েছে তার গায়ে। কোমরে বেল্ট লাগানো। তার উপরে গোড়ালি অবধি একটা আলখাল্লা। মূর্তিটার পায়ে বুটজুতোও রয়েছে। মূর্তিটির তলার দিকে ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা রয়েছে। তার থেকে জানা যায় সেটা কুষাণ সম্রাট প্রথম কনিষ্কের মূর্তি।

৬.৪ গুপ্ত সাম্রাজ্য

আনুমানিক ২৬২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ উত্তর ভারতে কুষাণ শাসন লোপ পেয়ে যায়। তারও প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশি পরে উত্তর ভারতে গুপ্তশক্তি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রথমদিকে গুপ্ত শাসকরা *মহারাজ* উপাধি নিতেন। তবে সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকে গুপ্ত শাসকরা *মহারাজাধিরাজ* উপাধি নিয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকেই গুপ্তদের শাসন ক্ষমতা অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল। ৩১৯-৩২০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত শাসক হন। ঐ সময় থেকেই *গুপ্তাব্দ* গোনা শুরু হয়। মধ্যগঙ্গা উপত্যকার ওপর ভিত্তি করেই গুপ্ত সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। সম্ভবত ৩৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম চন্দ্রগুপ্তের শাসন চলেছিল।

পরবর্তী শাসক সমুদ্রগুপ্তের আমলে (আনুমানিক ৩৩৫ থেকে ৩৭৫ খ্রিস্টাব্দ) গুপ্ত সাম্রাজ্য সবথেকে বড়ো আকার পেয়েছিল। উত্তর ভারত বা আর্যাবর্তের নয়জন শাসককে হারিয়ে দেন সমুদ্রগুপ্ত। অরণ্য বা আটবিক রাজ্যগুলিও তাঁর অধীনে এসেছিল। এর ফলে পূর্বে রাঢ় থেকে পশ্চিমে গঙ্গা উপত্যকার ওপরের অংশ পর্যন্ত গুপ্ত শাসন ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ ভারতেও বারোজন রাজাকে হারিয়ে দেন সমুদ্রগুপ্ত।

টুকরো কথা

এলাহাবাদ প্রশস্তি

এলাহাবাদ দুর্গের ভিতরে একটি শিলালেখ আছে। লেখটি গুপ্তযুগের ব্রাহ্মীলিপিতে ও সংস্কৃত ভাষায় খোদাই করা। এলাহাবাদের কৌশাম্বী গ্রামে লেখটি ছিল। পরবর্তী সময়ে মুঘল সম্রাট আকবর সেটিকে তুলে আনিয়ে এলাহাবাদ দুর্গের মধ্যে রাখেন। ঐ লেখটিতে প্রশস্তি খোদাই করা আছে। প্রশস্তিটি হরিষেণের লেখা। তিনি সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি ছিলেন। লেখটিতে আদতে সমুদ্রগুপ্তের গুণগান করা হয়েছে। সম্রাট হিসাবে সমুদ্রগুপ্তের যুদ্ধ, রাজ্যজয় প্রভৃতির কথা লেখটিতে আছে। পদ্য ও গদ্য দু-ভাষাতেই সেটি লেখা। যদিও সমুদ্রগুপ্তের প্রসঙ্গে শুধু ভালো কথাই লেখটিতে বলা হয়েছে। তবুও ওই সময়ের ইতিহাস জানার জন্য লেখটি জরুরি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান।

সুদূর দক্ষিণে তামিলনাড়ুর উত্তর-পূর্ব অংশ পর্যন্ত গুপ্ত শাসকের অধিকার কায়েম হয়েছিল। তবে দক্ষিণ ভারতে বারো জন রাজাকে শেষ পর্যন্ত রাজত্ব ফিরিয়ে দেন সমুদ্রগুপ্ত। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে শাসন টিকিয়ে রাখা সম্রাটের পক্ষে বোধহয় সম্ভব ছিল না। সে সময়ের কয়েকটি রাজশক্তি সমুদ্রগুপ্তকে কর দিত। তাদের বলা হতো *করদ* রাজ্য।

সমুদ্রগুপ্তের ছেলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৩৭৬ খ্রিস্টাব্দ (৫৬ গুপ্তাব্দ) নাগাদ শাসক হন। গুজরাট অঞ্চল থেকে শক-ক্ষত্রপ শাসকদের উচ্ছেদ করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। তাই তাঁকে বলা হয় *শকারি* (শক + অরি (শত্রু) = শকারি)। তাঁর আমলেই প্রথম রুপোর মুদ্রা চালু হয়। সম্ভবত শকদের হারিয়ে দেওয়ার প্রতীক হিসেবে ৪১০-৪১১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ঐ রুপোর মুদ্রা চালু করা হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলেও গুপ্ত সাম্রাজ্যের আয়তন বেড়েছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর সম্রাট হন প্রথম কুমার গুপ্ত (৪১৪–৪৫৪/৪৫৫ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর শাসনকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আয়তন ও ক্ষমতা আগের মতোই ছিল। তিনি সাম্রাজ্যে নানারকম মুদ্রা চালু করেছিলেন। তাঁর সময়েই নালন্দা মহাবিহার স্থাপিত হয়। প্রথম কুমারগুপ্তের ছেলে স্কন্দগুপ্ত এরপর সম্রাট হন। আনুমানিক ৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে হূণরা আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত সফলভাবে সেই আক্রমণ রুখে দিয়েছিলেন। তিনি সম্ভবত শেষ গুপ্ত সম্রাট যাঁর শাসন এলাকা ছিল বিরাট। তাঁর পর থেকেই গুপ্তদের শক্তি কমতে থাকে। ছোটো ছোটো স্থানীয় শাসকরা গুপ্ত শাসকদের অমান্য করতে থাকে। ফলে উত্তর ভারতে বেশ কিছু আঞ্চলিক শাসন দেখা দেয়।

দাক্ষিণাত্যে বাকাটক শাসন

উত্তর ভারতে গুপ্ত শাসনের সময়েই দাক্ষিণাত্যে বাকাটক শাসন শুরু হয়েছিল। আনুমানিক ২২৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাকাটক শক্তি দাক্ষিণাত্যে বড়ো হয়ে দেখা দেয়। সাতবাহন শাসন ততদিনে লোপ পেয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে দাক্ষিণাত্য ও মধ্য ভারতের বড়ো এলাকা জুড়ে বাকাটক শাসন ছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মেয়ে প্রভাবতীগুপ্তার বিয়ে হয়েছিল বাকাটক-রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে। তার ফলে দাক্ষিণাত্যেও গুপ্ত শাসনের প্রভাব তৈরি হয়েছিল। দ্বিতীয় রুদ্রসেন মারা যাওয়ার পর প্রভাবতীগুপ্তাই বাকাটক শাসন চালিয়েছিলেন।

অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণ ভাগে ক্রমশই পল্লবদের শক্তি বাড়ছিল। আনুমানিক সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে দক্ষিণ ভারতে চালুক্য ও পল্লবরাই হয়ে উঠেছিল প্রধান শক্তি। মনে রেখো, দক্ষিণের পল্লবরা কিন্তু পহ্লব বা পার্থীয়দের থেকে আলাদা।